৯ জুলাই যৌথ কনভেনশনের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত

২ সেপ্টেম্বর রাজ্য প্রশাসনে ধর্মঘট

যৌথ কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ২১টি সংগঠনের যৌথমঞ্চ রাজ্য সরকারের তীব্র আর্থিক বঞ্চনা ও প্রশাসনিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ৯ দফা দাবিতে আগামী ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, বিগত ২৫ মে নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কনভেনশন থেকে ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ৫০ টিরও বেশী ফেডারেশন ১২ দফা দাবিতে ২ সেপ্টেম্বরেই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এর আগে এ রাজ্যেও পরিবর্তনের সরকারের জমানায় ২০১২-র ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ২০১৩-র ২০ ফেব্রুয়ারির সর্বভারতীয় ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন এ রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারীরা এবং সেই লড়াইয়ে বাকি সবার মতো এই অংশও সরব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে। এবারের ধর্মঘটে যৌথ মঞ্চের ৯ দফা দাবির মধ্যে ৭ দফাই রাজ্য সরকারের কাছে তোলা দাবি। সেই বিচারে ২ সেপ্টেম্বরের সর্বভারতীয় ধর্মঘটে এই যৌথ মঞ্চের ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত সমগ্র আন্দোলনকে আরো তীব্র ও গতিশীল করবে। এক কথায় এ রাজ্যে আসন্ন ধর্মঘট এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। ১৯৭০ সালের প্রায় সাড়ে চার দশক পরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি নিজস্ব দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘটে যাচ্ছে। তাই কোনোরকম চাপ বা প্রলোভনের কাছে নতিস্বীকার না করে গভীর আত্মবিশ্বাস ও অসীম মনোবল নিয়ে এই ধর্মঘটকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে গিয়ে সরকারকে কড়া বার্তা দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে বার্তা দিলেন নেতৃবৃন্দ।

বিগত ৯ জুলাই মৌলালী যুব কেন্দ্রে ২১টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন পরিচালনা করেন অশোক পাত্র (রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি), উৎপল রায় (এ বি টি এ), সত্যেন মজুমদার (পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন), রাম প্রসাদ সেনগুপ্ত (কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন), সুজিত হরি দত্ত (কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন), কুন্তল কান্তি মণ্ডল (জয়েন্ট কাউন্সিল), মৃণাল দাস (পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন) ও তপন চক্রবর্তী (ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, নব পর্যায়)-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন যৌথ মঞ্চের ওয়ার্কিং কমিটির আহ্বায়ক তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। তিনি বলেন বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রথম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ২৭ মার্চ ২০১৪ মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে, যাতে জোটবদ্ধ হয়েছিল ৬টি সংগঠন। দ্বিতীয় কনভেনশনে ১৪ নভেম্বর ২০১৪ তে একত্রিত হয় ১৫টি সংগঠন এবং আজ ৯ জুলাই ২০১৫ তৃতীয় কনভেনশনে সমষ্টিবদ্ধ হয়েছে ২১টি সংগঠন। এভাবেই অগ্রগতি ঘটছে ঐক্যবদ্ধ লড়াই আন্দোলনে। বর্তমানে এ রাজ্যের ফ্যাসিস্ট সরকার কর্মচারীদের উপর যে আর্থিক বঞ্চনা (বকেয়া ৪৮% মহার্ঘ ভাতা, ৫ম বেতন কমিশনের ২য় অংশের সুপারিশ কার্যকর না করা, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন না করা) ও প্রশাসনিক দমনপীড়ন (হয়রানিমূলক বদলী বিশেষতঃ সংগঠনের নেতৃবৃন্দের, বেনিয়মে শাসক দলের লোককে নিয়োগ) সহ একাধিক কর্মচারী বিরোধী আদেশনামা প্রকাশ করেছে। এসবের বিরুদ্ধে কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন মত ও নীতির ২১টি ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে এই বঞ্চনা ও অবহেলার জবাব দেবেন সমগ্র কর্মচারী সমাজ ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটে গোটা রাজ্যকে স্তব্ধ করে। এরপর তিনি যৌথ মঞ্চের ৯ দফা দাবি প্রস্তাব পাঠ করেন।

প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন এ বি পি টি এ-র সমর চক্রবর্তী, সি আই টি ইউ-র পক্ষে শ্যামল চক্রবর্তী ও দীপক দাশগুপ্ত, আই এন টি ইউ সি-র পক্ষে রমেন পাণ্ডে, এ আই টি ইউ সি-র কুমারেশ কুণ্ডু, এ আই সি সি টি ইউ-র বাসুদেব বসু, এ আই টি টি ইউ সি-র দিলীপ ভট্টাচার্য ও ইউ টি ইউ সি-র অশোক ঘোষ।

শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

১৩ আগস্ট ২০১৫ মুখ্যসচিবের নিকট যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান এবং রানি রাসমনি এভিনিউতে ছুটির পর বিশাল কেন্দ্রীয় জমায়েতের কর্মসূচী এবং ঐ দিনই জেলায় জেলায় জেলা শাসকের নিকট যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান এবং জেলা সদরে ছুটির পর শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সমাবেশ।

ধর্মঘটের সমর্থনে অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রচার কর্মসূচী অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচারে নেতা-কর্মীবৃন্দ

রাজ্যে ধর্মঘটের দাবিসমূহ

১। রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত, শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া ৪৮% মহার্ঘভাতা অবিলম্বে দিতে হবে।

২। রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন/কমিটি অবিলম্বে গঠন করতে হবে এবং বেতন কমিশন/ কমিটির সুপারিশসমূহ ১ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে কার্যকরী করতে হবে।

৩। হয়রানিমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বদলী রদ এবং সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে অভিসন্ধিমূলক বদলীর আদেশনামা বাতিল করে পূর্ববর্তী স্থানে ফিরিয়ে দিতে হবে।

৪। ৫ম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের (অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটি) অবশিষ্ট কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশসমূহ দ্রুত কার্যকর করতে হবে। সরকারী পরিষেবা ও নিয়ন্ত্রণে সকল শ্রমিক-কর্মচারীসহ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেনশন সুনিশ্চিত করতে হবে। স্থায়ী গ্রুপ-সি পদে নিয়োগের নতুন আদেশনামা বাতিল করতে হবে।

৫। স্থায়ী প্রশাসনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, বিধিবদ্ধসংস্থায় সর্বস্তরে শূন্যপদগুলি স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে। পি এস সি-র পরিকাঠামো খর্ব করা চলবে না। শিক্ষার অধিকার আইন বা অন্য কোনো অজুহাতে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে কর্মচ্যুত করা যাবে না। স্থায়ীপদে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। সর্বস্তরে পদসমূহ পি এস সি-র মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

৬। চুক্তিপ্রথায় ও অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী সহ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্থায়ীকরণ এবং ওয়ার্ক-চার্জড কর্মচারীদের (১০ বছরের বেশি চাকুরীকাল) রেগুলার এসট্যাব্লিসমেন্টে যুক্ত করতে হবে।

৭। ধর্মঘট সহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে। শিক্ষার মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে সমাজ বিরোধীদের হামলা বন্ধ করতে হবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এবং বোর্ড-কর্পোরেশনের কর্মচারীদের হেলথ স্কীম-২০০৮ এ যুক্ত করতে হবে। কোনো মতেই এই অংশের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ই এস আই-তে যুক্ত করা চলবে না। ক্যারিয়ার এ্যাডভান্সমেন্ট স্কীমে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এবং বোর্ড-কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েত কর্মচারীদের যুক্ত করতে হবে।

৮। নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৯। মালিকশ্রেণীর স্বার্থে শ্রম আইনসমূহ সংশোধনের অপচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। চুক্তিপ্রথায় ও অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম ১৫,০০০ টাকা মজুরী চালু করতে হবে। □

রাজ্য কাউন্সিলের আহ্বান

বঞ্চনা ও আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘটই পথ

মনোজ কান্তি গুহ

গত ৪-৫ জুলাই সপ্তদশ রাজ্য কাউন্সিলের পঞ্চম সভা সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় বিগত রাজ্য কাউন্সিল সভা থেকে গৃহীত সাংগঠনিক ও আন্দোলনগত কর্মসূচীর পর্যালোচনার পাশাপাশি বর্তমান জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করা হয়। রাজ্য কাউন্সিল সভা মনে করেছে, রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ বোর্ড-কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েতের কর্মচারীরা যেভাবে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা ও আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, তাকে প্রতিহত ও মোকাবিলা করার প্রশ্নে বিগত কর্মসূচীগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, চূড়ান্ত কর্মচারী বিদ্বেষী রাজ্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হলে আরেও বৃহত্তর সংগ্রামের পথে যাওয়া প্রয়োজন। আর বৃহত্তর সংগ্রামের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন

বিজয় শঙ্কর সিন্‌হা

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার
জুলাই ২০১৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৪ তম বর্ষ □ তৃতীয় সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

আসুন, ঐতিহ্যের প্রতি সুবিচার করি

ধর্মঘটের ইতিহাস আমাদের দেশে বেশ পুরনো, বা বলা ভালো বহু পুরনো। যতদূর জানা যায় প্রথম ধর্মঘট হয়েছিল ১৮৬২ সালে। হাওড়ার রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট। ১৮৬২, অর্থাৎ, ঐতিহাসিক মে দিবসেরও ২৪ বছর আগে। স্বভাবতই গর্ব করার মতোই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরা। ১৮৬২ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর— উভয় পর্বেই আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষ বহু ধর্মঘট সংগঠিত করেছেন। এর কোনটি ক্ষেত্রভিত্তিক, কোন্‌টি একাধিক ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের যৌথভাবে, কোনটি রাজ্যস্তরের আবার কোনটি সর্বভারতীয় স্তরের ধর্মঘট। ধর্মঘটগুলির কারণও ছিল বিভিন্ন। কখনও নিজস্ব অর্থনৈতিক বা অধিকারগত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শ্রমিক-কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছেন, আবার কখনও বা রাজ্য বা সর্বভারতীয় স্তরে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁদের ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য করেছে। অর্থনৈতিক বা অধিকারগত দাবি অর্জন বা অর্জিত অধিকারসমূহকে রক্ষার জন্য আন্দোলন-সংগ্রামের অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি ব্যর্থ হলে, সর্বাধিক শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ধর্মঘটের প্রয়োগ শিল্প পুঁজিতন্ত্রের জন্মলগ্ন থেকেই দৃশ্যমান। আবার, নিজস্ব বৃত্তিগত দাবিদাওয়ার গণ্ডী পেরিয়ে রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধেও ধর্মঘটের মাধ্যমে সরব হয়েছেন শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমজীবী মানুষ— এমন বহু উদাহরণও ছড়িয়ে রয়েছে সারা পৃথিবীতে। এই ধরনের ধর্মঘটগুলির মধ্যে সম্ভবত প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত ইংলন্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন (১৮৩৭)। আমাদের দেশেও প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বাল গঙ্গাধর তিলকের মুক্তির দাবিতে বোম্বের সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে (১৯০৮)।

ধর্মঘট নিয়ে এতগুলো কথা বলার কারণই হল, কয়েকশ বছর ধরে সমাজ ও অর্থনীতির বহু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু আজও ধর্মঘটের গুরুত্ব এতটুকু হ্রাস পায়নি। আজও শোষণ ও বঞ্চনার খাদের কিনারায় পৌঁছে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষকে ধর্মঘটের পথে যেতেই হয়। অর্থাৎ শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায়, অবিচার যতদিন থাকবে— তা শিল্প মালিক, রাষ্ট্র পরিচালক বা রাজ্য সরকার যার তরফেই হোক্ না কেন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র হিসেবে ধর্মঘটের প্রাসঙ্গিকতা থাকবেই। যাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর হাতিয়ার হিসেবে ধর্মঘটের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, বলা বাহুল্য তাদের ঘোরতর অপছন্দের বিষয় হল ধর্মঘট। তাই একে দুর্বল করার জন্য, ভোঁতা বা অকার্যকরী করার জন্য যুগ যুগ ধরেই বিভিন্ন প্রক্রিয়া তারা গ্রহণ করেছে। হুমকি প্রদর্শন, শাস্তি প্রদান, আইন করে হাত-পা বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা— এসবতো রয়েছেই, পাশাপাশি কৌশলে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অনৈক্য তৈরি করেও ধর্মঘটকে ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়।

মালিক পক্ষ, শাসকশ্রেণী বা শাসক দলের এই প্রচেষ্টা যে কখনও সফল হয়নি, তা নয়। হয়েছে, বিভিন্ন সময়েই হয়েছে। তবে তা হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। সাধারণভাবে কোনকালেই শ্রমজীবীদের ধর্মঘট থেকে বিরত করা যায়নি। এমনকি গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, যখন প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই উদারবাদী অর্থনীতির পথ অনুসৃত হচ্ছে, তখনও শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষ দেশে দেশে বারংবার ধর্মঘট করেছেন, করছেন। অথচ বাস্তবিকই অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষ বর্তমানে বিপুল প্রতিকূলতার মুখোমুখি। প্রথমত, উৎপাদনের উপকরণের বৈপ্লবিক আধুনিকীকরণের ফলে শ্রমনিবিড় বৃহদাকার শিল্প সংস্থার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের একই সংস্থার মধ্যে সংগঠিত হবার সুযোগ কমছে। ধর্মঘটের আইনী স্বীকৃতি রয়েছে এমন সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রে যুক্ত শ্রমজীবীদের ধর্মঘটের অধিকারতো দূরের কথা, ন্যূনতম সংগঠন করার অধিকারটুকুও নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষকে দমানো যায়নি। তাঁরাও নতুন নতুন পথ খুঁজে বের করে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে চলেছেন। সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্র বা সংগঠন নির্বিশেষে ঐক্য গঠনের প্রক্রিয়াও অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় আরও বেশী জোরদার হচ্ছে।

আমাদের দেশেও ১৯৯১ পরবর্তী সময়কালে এই প্রবণতা স্পষ্ট। আগামী ২ সেপ্টেম্বরের ঘোষিত ধর্মঘটটিকে ধরলে গত ২৪ বছরে (১৯৯১-২০১৫) ১৬টি সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। গড়ে প্রতি দেড় বছরে একটি করে সর্বভারতীয় ধর্মঘট। ১৯৪৭-এর পরে ১৯৯১ পর্যন্ত কিন্তু এত ঘন ঘন সর্বভারতীয় ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হবার কোন নজির নেই। এই পর্বের দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখযোগ্য তা হল শ্রমজীবীদের সার্বিক ঐক্য গড়ে তোলা। বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে বি এম এস এবং আই এন টি ইউ সি-র মতন সংগঠনগুলিও বর্তমানে ধর্মঘটে শামিল হচ্ছে। শুধুমাত্র সর্বভারতীয় স্তরে এই ঐক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে তা নয়, শিল্প ভিত্তিক ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক কথায় শ্রমিকশ্রেণীকে হীনবল করার জন্য শাসকশ্রেণীর যে কৌশল, তাকে প্রতিহত ও পরাভূত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীও লড়াই-এর নতুন স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করছে এবং একথাও নির্দ্বিধায় বলা যায়, আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী এই কাজে অনেকটাই সফল। দুদিক থেকে এই সাফল্যকে বিচার করা যায়। প্রথমত, যতদিন যাচ্ছে সর্বভারতীয় ধর্মঘটে অংশগ্রহণের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, শাসকশ্রেণীও তাদের আর্থিক সংস্কারের কর্মসূচীকে কার্যকরী করতে গিয়ে পদে পদে ঠোক্কর খাচ্ছে।

আমরা এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা শ্রমজীবীদের ঐ নিখিলভারত ঐক্য গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় শামিল ছিলাম, এখনও আছি। শুধু তফাৎ হল ২০১১ সালের মে মাসের আগে পর্যন্ত ঐ লড়াইয়েই আমরা সামগ্রিক মনোনিবেশ করতে পারতাম, কারণ রাজ্য স্তরে প্রশাসনিক আক্রমণ ও বঞ্চনার আমরা শিকার হইনি কখনও। উদারবাদী অর্থনীতির শুরুর পর্ব থেকে ২০১১-র মে পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে অনুকূল বাতাবরণ, প্রশাসনের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ আমাদের সুযোগ করে দিয়েছিল সামগ্রিক সাংগঠনিক শক্তিকে কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে লড়াই-এ নিয়োজিত করার জন্য। তার মানে অবশ্য এটা নয় যে, রাজ্যস্তরে আমাদের কোন ভূমিকা ছিল না। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া দাবি ও অধিকার অর্জনের জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সততই সক্রিয় ছিল। সাফল্যও এসেছে বিপুল। তবে, তৎকালীন রাজ্য সরকারের কর্মচারী স্বার্থবাহী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য ঐ বিপুল সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আলোচনার টেবিলে বসেই। কেড়ে নেওয়া বা লড়ে নেওয়ার পরিস্থিতি কখনই সৃষ্টি হয়নি। ফলত সংগঠন ধর্মঘট সহ আন্দোলন-সংগ্রামের সমস্ত অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, দেশব্যাপী গড়ে ওঠা শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এ অংশ নিতে পেরেছে।

২০১১-র মে মাসে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। বর্তমান প্রজন্মের কর্মচারীদের কাছে এযাবৎকাল যে ধরনের আক্রমণ ও বঞ্চনা ছিল একেবারেই অপরিচিত, তারই শিকার হতে শুরু করেন কর্মচারীরা। প্রশাসনের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, সরকারের সাথে আলোচনার টেবিলে বসার কোনো সুযোগই থাকে না। দাবি-দাওয়া উপেক্ষিত হতে থাকে। নামতে শুরু করে অনৈতিক বদলি সহ বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক আক্রমণ। জেলায় জেলায় এমনকি প্রশাসনের বাইরের রাজনৈতিক শক্তিও কর্মচারীদের বিভিন্নভাবে হেনস্থা করতে শুরু করে। এমতাবস্থায়, বিদ্যমান পরিস্থিতির মোকাবিলায় সংগঠনও আন্দোলন-সংগ্রামের পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। মাঝে দীর্ঘ সময় এই ধরনের কোন কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও, ১৯৭৭ পূর্ববর্তী প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলার অভিজ্ঞতা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করেই, সংগঠন বুক চিতিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামের উত্তরণ ধাপে ধাপে ঘটে। এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে উত্তরণের পূর্বে সংগঠন সংহত করে নিজের সাংগঠনিক শক্তিকে। এই ভাবেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি অগ্রসর হয়েছে। প্রসারিত করেছে ঐক্যকে। গণতান্ত্রিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত পদ্ধতিকে ব্যাবহার করেছে। পথ চলতে চলতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বহু বন্ধু, কারণ তাঁদের অভিজ্ঞতাও একই। কিন্তু কার্যত কোন সমস্যারই কোন সুরাহা হয়নি। উপরন্তু বঞ্চনা ও আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় চূড়ান্ত ধাপে আন্দোলনের উত্তরণ ঘটানো ছাড়া আর কোন পথ নেই। পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন যে বন্ধুরা তাঁরাও একমত। তাই এবার ২১টিরও বেশী সংগঠন যৌথভাবে ডাক দিয়েছে চূড়ান্ত লড়াইয়ের— অর্থাৎ ধর্মঘট। ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন আরও ১০টিরও বেশী সংগঠন। এক নজিরবিহীন ইতিহাসের সাক্ষী হতে চলেছি আমরা, কারণ এই প্রথম রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন পান এমন সমস্ত অংশের শ্রমিক-কর্মচারীরা একসাথে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে যাচ্ছেন।

২ সেপ্টেম্বর পৃথক দাবি সনদের ভিত্তিতে আমরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ডাকলেও, ঐ একই দিনে আহূত কেন্দ্রীয় ধর্মঘটের প্রতিও আমাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে, কারণ দেশব্যাপী ধর্মঘটটি অনুষ্ঠিত হবে উদারবাদী অর্থনীতির অভিমুখের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য। শাসকশ্রেণী উদারবাদী অর্থনীতিকে সহজে এদেশের বুকে লাগু করার স্বার্থেই বামপন্থীদের দুর্বল করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল। সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে এ রাজ্যে বামফ্রন্টকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে একটি স্বৈরাচারী শক্তিকে ক্ষমতায় বসানোর মধ্য দিয়ে।

তাই আমাদের এই ধর্মঘট হবে ২ সেপ্টেম্বরেই। যেদিন সারা দেশের শ্রমজীবী মানুষ ধর্মঘট করবেন, সেদিনই তাঁদের লড়াই থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আমরাও ধর্মঘটে যাব রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। প্রশাসনকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করার সঙ্কল্প নিয়েই আমরা রাস্তায় নামব। □

২২ জুলাই, ২০১৫

'সকলই তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী ...'

মনুষ্য প্রজাতির সবিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল নব নব উদ্ভাবনী শক্তি। ইহা প্রাণীকূলের অপর কোন প্রজাতির মধ্যে নাই। মানব সমাজের প্রগতি যানে চক্রের ভূমিকা পালন করিয়াছে এই উদ্ভাবনী ক্ষমতা। ইহার সাহায্যেই কৃষিভিত্তিক পশ্চাদ্‌পদ সমাজ ব্যবস্থা বিবর্তিত হইয়া আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শিল্পভিত্তিক সমাজও স্থাণু হইয়া থাকে নাই। তাহারও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে। মানব জাতির উদ্ভাবনী ক্ষমতাই সভ্যতাকে যন্ত্রচালিত তাঁত আর বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের যুগ হইতে তথ্য ও প্রযুক্তির মায়াবী জগতে উত্তরণ ঘটাইতে সক্ষম করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া যাঁহাদের অত্যাশ্চর্য মেধা ও দক্ষতার এহেন সুফল মানব জাতি ভোগ করিতেছে, তাঁহারা সকলেই বরেণ্য।

সম্প্রতি এই বঙ্গভূমিতেও অত্যাশ্চর্য উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন এক ক্ষণজন্মার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে যাহার ঝলক দেখিয়া বঙ্গবাসী যৎপরোনাস্তি পুলকিত। প্রতিটি স্ফুরণকে লইয়া আলোচনা করিবার সাধ থাকিলেও মেধাগত স্বল্পতার কারণে এই অধমের সেই সাধ্য নাই। তাই উজ্জ্বলতম কয়েকটি মণি-মুক্তাকে চয়ন করিয়া হাজির করিবার প্রয়াস গ্রহণ করা হইল। বামন হইয়া চন্দ্র স্পর্শ করিবার ন্যায় স্পর্ধা হিসেবে ইহা বিবেচিত হইলে মার্জনা করিবেন।

সাম্প্রতিকতম একটি উদ্ভাবনী ক্ষমতার নিদর্শন লইয়া আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো যাইতে পারে। ক্ষণজন্মা ঘোষণা করিয়াছেন বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ে 'ল্যাংচা হাব' হইবে। কথিত রহিয়াছে বৃক্ষ হইতে আপেল ভূলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া নিউটন সাহেব পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রাথমিক অনুমানখানি করিয়াছিলেন। ঠিক তেমনই শততম প্রশাসনিক মজলিস্-এ গলদা চিংড়ি, চিকেন, মাটন উদরসাৎ করিবার পর মধুরেণ সমাপয়েৎ হেতু শক্তিগড়ের ল্যাংচায় কামড় বসাইয়া উক্ত চিন্তা ক্ষণজন্মার মস্তিষ্কে ঝিলিক মারিয়াছে। উত্তম চিন্তা সন্দেহ নাই কারণ রাজ্যব্যাপী অলিতে-গলিতে তেলেভাজা শিল্পের প্রসার এবং এই ক্ষেত্রটিতে কতিপয় কোটি (!) কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাপনা হইবার পশ্চাতেও যাঁহারা কর্মহীন থাকিবেন, তাঁহাদের 'ল্যাংচা হাব'-এ কর্মসংস্থান হইবে। কর্মহীনতার সমস্যা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিবার জন্য অনুরূপ কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার সুপারিশ আমরা করিতে পারি। যেমন মালদহে 'ল্যাংড়া হাব', কৃষ্ণনগরে 'সরভাজা হাব', চন্দননগরে 'জলভরা তালশাঁস সন্দেশ হাব' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা নিশ্চিত উপরোক্ত হাবগুলি এক যোগে উৎপাদন শুরু করিলে যে পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইবে, তৎ পরিমাণ জীবন্ত কর্মহীন যুবক-যুবতী আমাদের রাজ্যে সম্ভবত মিলিবে না— সেক্ষেত্রে কুমারটুলি হইতে বায়না করিয়া আনিতেও হইতে পারে। যাহাই হউক, শিল্প সম্পর্কিত যে বিপুল উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় আমরা পাইতেছি, তাহাতে কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতীগণের উদরপূর্তি হউক আর না হউক, স্বপ্নে ঢেকুর উঠিতে বাধ্য। কিন্তু, কিঞ্চিৎ সমস্যাও রহিয়াছে। যাহা 'নজর-আন্দাজ' করিবার উপায় নাই। প্রথমত, রাজ্যে এখনও জমি নীতি স্থিরীকৃত হয় নাই। স্বভাবতই 'ল্যাংচা হাব' বা 'ল্যাংড়া হাব' করিতে হইলে যে জমির প্রয়োজন তাহা পাওয়া যাইবে তো? দ্বিতীয়ত, স্থানীয় মস্তান বাহিনী যদি প্রত্যহ তোলা হিসেবে বিনামূল্যে ল্যাংচা অথবা সরভাজা গলধঃকরণ করিতে শুরু করে, তাহা হইলে ময়রাকূল বিনিয়োগে আদৌ উৎসাহিত বোধ করিবে তো? তৃতীয়ত এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইল, বর্ধমান জেলায় ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাইয়া, অভাবের তাড়নায় যে ১০৩ জন কৃষক আত্মহত্যা করিয়াছেন, 'ল্যাংচা হাবে' তাঁহাদের পরিবার পিছু একজনের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত হইবে কি?

অপ্রাসঙ্গিক মনে হইলেও সর্বশেষ প্রশ্ন ঃ যে জেলায় শতাধিক কৃষক অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করিলেন, তাঁহাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের চোখের সামনে বসিয়া এলাহি ভোজ খাইবার সময় 'মা-মাটি-মানুষ'-এর হৃদয় এতটুকুও কম্পিত হইল না? ছিঃ। □

৫ শ্রাবণ, ১৪২২

রক্তদান

বাঁকুড়া

গত ২ জুন ২০১৫, কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলা সদরের রক্তদান কর্মসূচী সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে দেড় শতাধিক সাধারণ কর্মচারীর উপস্থিতিতে রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক, প্রবীণ নেতা পার্থ ঘোষ। তিনি বর্তমান সময়ের পরিস্থিতি ও তার সাথে রক্তদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়-দায়িত্বের প্রশ্ন এবং তার প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। পরিবার পরিজন সহ সর্বমোট ২৭ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। যার মধ্যে মহিলা ৬ জন।

এছাড়া গত ১০ জুন ২০১৫, বিষ্ণুপুর মহকুমায় রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলার সহ সম্পাদক সজল পণ্ডিত রক্তদান কর্মসূচী উদ্বোধন করেন। এই প্রতিকূল সময়কালে বিষ্ণুপুর মহকুমায় একজন পরিবারের মানুষ সহ ৩২ জন রক্তদান করেন। এছাড়া ১০০ জনের মত কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

আগামী দিনে খাতড়া মহকুমায় রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন

ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে কলকাতার লবণ হ্রদ অঞ্চলের অরণ্য ভবনে আয়োজিত রক্তদান শিবির ১০ জুলাই ২০১৫ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক বিজয় শংকর সিনহা। তিনি সংগঠনকে এই রকম সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তার প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। এ ছাড়াও সমিতির সাধারণ সম্পাদক অমল চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রক্তদান কর্মসূচীর এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির স্থায়ী সভাপতি সুবল পুতুতুণ্ড। এই কর্মসূচীতে সংগঠনের বর্ষীয়ান নেতৃত্ব, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লবণ হ্রদ অঞ্চল কমিটির নেতৃত্ব, বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতৃত্ব সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় দুই শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে ৪(চার) জন মহিলা সহ মোট ৪০ জন রক্তদান করেন। □

আলোচনা সভা

গত ১৯ জুলাই ২০১৫,**পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ড্রাইভার্স ও মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের** উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল উদারনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ-সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিন্‌হা। □

কেন ২ সেপ্টেম্বর'১৫ সর্বভারতীয় ধর্মঘট ?

মোদি সরকারের এক বছর

শাশ্বতী মজুমদার

(এই পত্রিকার মে সংখ্যায় এই নিবন্ধটির প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যায় দ্বিতীয় তথা শেষাংশ প্রকাশিত হল।)

এ বছর কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন—"আমাকে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে রোগীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য কিছু তেতো ওষুধ দিতে হবে। এই ওষুধে আপনাদের অনেকের কষ্ট হবে, কিন্তু এখন আপনাদের সমর্থন করতে বলবো।" এই সময়েই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন নিউইয়র্কে মোদিকে 'বিনিয়োগকারীদের' অনুকূল বলে উল্লেখ করেন। 'বিনিয়োগকারী' ছাড়া ভারতবর্ষের জনসংখ্যার অন্যান্য যেসব অংশ আছে, তাদের সম্পর্কে যে তিনি একই আনুকূল্য দেখাবেন না বোঝা যায় যখন বাজেটে কর্পোরেট ট্যাক্সে ৫ শতাংশ ছাড় ঘোষিত হয়। এর সঙ্গে যে দ্রুততায় তিনি শ্রম আইন সংস্কারে হাত দিয়েছেন, জমি অধিগ্রহণ বিল সংসদে পাশ করানোয় উদ্‌গ্রীব হয়েছেন তাতে কর্পোরেটে বান্ধব চরিত্র আরও প্রকাশিত হয়েছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বা 'সহজে ব্যবসা করার সুযোগ'—এইসব বক্তব্যের আড়ালে শ্রমিকদের অধিকার হরণের তোড়জোড়, কৃষক সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা-স্বার্থের ওপর আঘাত, পরিবেশের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে চূড়ান্ত অবিবেচক সিদ্ধান্তসমূহ মোদি সরকার সম্বন্ধে মানুষের মোহভঙ্গ ঘটাচ্ছে এক বছরের মধ্যেই। অবস্থা এমনই ভারতীয় মজদুর সঙেঘর মতো সংগঠন, যারা সঙঘ পরিবারেরই সদস্য, তারাও জনবিরোধী-শ্রমিক বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমান সরকারের এক বছরের কয়েকটি দিক নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করবো।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ঃ প্রচারের সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই—

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গগনচুম্বী প্রত্যাশার পালে বাতাস দিয়ে মোদি প্রধানমন্ত্রীর গদি দখলের লক্ষ্যে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু একবছর পরে দেখা যাচ্ছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর প্রতিশ্রুতি পূরণের মধ্যে ব্যবধান অনেক। ইউপিএ-২-এর সময়ে অর্থনৈতিক নীতির পঙ্গুত্ব নিয়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় তুলেছিল এনডিএ, অথচ গত এক বছরে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সামান্য উন্নতিরও কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে নয়া উদারনীতির প্রয়োগে নিষ্ঠুরতার যেটুকু এর আগে পর্যন্ত বাকী ছিল, এই সরকার সেই চক্ষুলজ্জাটুকুও ভুলে যেতে চাইছে, যাতে বড়লোকদের সরাসরি খুশির বার্তা দেওয়া যাবে। আক্রমণাত্মক কোষাগারীয় নীতির ফলে সামাজিক ক্ষেত্রের ব্যয়বরাদ্দে বড়সড় ছাঁটাই দেশের প্রান্তিক মানুষকে গিলোটিনের সামনে দাঁড় করিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেটের ওপর সিএজি-র সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ক্রমশ কমছে। ২০১২-১৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ও জিডিপি-র অনুপাত ছিল ১৪.১ শতাংশ, ২০১৩-১৪ সালে তা হয়েছে ১৩.৮ শতাংশ, ২০১৪-১৫ সালে তা আরও কমে হয়েছে ১৩ শতাংশ। অবস্থা এমনই যে বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রী তো বটেই এমনকি নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রী পর্যন্ত এভাবে ব্যয়সঙ্কোচনের ক্ষেত্রে নিজেদের অসম্মতি জানিয়েছেন। নারী ও শিশু কল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছাঁটাইয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন প্রায় ৩ কোটি গরিব মানুষ, জানিয়েছেন ঐ মন্ত্রী।

লোকসভা নির্বাচনের প্রচারপর্বে বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মোদীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা উঠে এসেছিল। মোদির মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে ২০১২-১৩ সালের ক্যাগ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল, গুজরাট সরকার রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এসার স্টিল এবং আদানি পাওয়ার লিমিটেডকে নিয়ম বহির্ভূত সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের ৭৫০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছিল এক বছরে। কেন্দ্রীয় সরকারে অধিষ্ঠিত থেকে মোদি এই ভূমিকা নেবেন এটাই ছিল বৃহৎ পুঁজিপতিদের প্রত্যাশা। বর্তমান সরকারের ওপর প্রভাব খাটানোর সমস্ত চেষ্টা তারা করে যাচ্ছে।

অন্যদিকে অর্থনীতির সব ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির নিম্নমুখী হার অব্যাহত থাকায় সব মহলেই উদ্বেগ বাড়ছে। শিল্প ক্ষেত্রে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মে-অক্টোবর, ২০১৪ সময়পর্বে বৃদ্ধির হার (+) ৫.৯ শতাংশ থেকে (–) ৫.৬ শতাংশে বিপর্যয়করভাবে পড়ে গিয়েছিল। যদিও নভেম্বর, ২০১৪-তে ঐ বৃদ্ধির হার বেড়ে ৪.৯ শতাংশ হয়েছিল, মার্চ, ২০১৫-তে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধির সামগ্রিক হার ২.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন কমছে, কোথাও খরা, কোথাও অসময়ে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ২০১৪-১৫ শস্য বর্ষে (জুলাই থেকে পরবর্তী জুন) উৎপাদন কমবে ৫.৩ শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে কৃষক আত্মহত্যার সংবাদ আসতে শুরু করেছে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে।

'আচ্ছে দিন আনেওয়ালে' স্লোগানের অন্তঃসারশূন্যতা যখন চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে, দেশীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে গভীর সঙ্কট থেকে বের হবার বাস্তবোচিত পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে মোদী স্লোগানসর্বস্ব, বাগাড়ম্বরমূলক প্রচারের ওপর জোর দিয়ে জনগণকে নতুন করে মিথ্যে আশ্বাসে ভোলানোর রাস্তা নিয়েছেন।

১। মেক ইন ইন্ডিয়া স্লোগানের ধাপ্পা— 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র স্লোগানের লক্ষ্য হল বিদেশী পুঁজিকে আকর্ষণ করা যাতে তারা এদেশে প্রাপ্ত সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন করার জন্য এখানে 'হাব' গড়ে তোলে এবং এই বিনিয়োগের মাধ্যমে এদেশের পরিকাঠামো গড়ে তোলা।

কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন প্রথম থেকেই এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে যখন বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি অব্যাহত তখন কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্লোগান কোনো কাজে আসবে না, বরং দেশীয় বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ হবে অনেক বাস্তবোচিত।

শিল্পপতিদের ব্যবসা করতে বর্ধিত সুবিধা করে দেওয়ার নাম করে প্রশাসনিক নানা নিয়ন্ত্রণবিধি যতদূর সম্ভব শিথিল করে দেওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ আইন যে দ্রুততায় করা হয়েছে যেন জমি অধিগ্রহণই শিল্পক্ষেত্রে একমাত্র বাধা। অথচ, শিল্পপতিদের একাংশের বক্তব্য, বড় শিল্প প্রকল্পে জমি বাবদ ব্যয় মোট প্রকল্পের ব্যয়ের মাত্র একটা সামান্য অংশ। গত বছর কর্ণাটকে আরসেলর মিত্তালকে ২,৬৫৯ একর জমি দেওয়া হয় ইস্পাত প্রকল্পের জন্য, কিন্তু এখনও ঐ প্রকল্পের কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। এরকম বহু উদাহরণ সারা দেশ জুড়েই আছে।

শিল্প মহলের একাংশের বক্তব্য প্রচার আর বাস্তবের ফারাক অনেক বেশি। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর হাতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্য বহু ক্ষেত্রেই অসুবিধা হচ্ছে। প্রসারিত প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ঘটছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ক্ষমতা বৃদ্ধিও অনেকক্ষেত্রে আশঙ্কা জাগাচ্ছে বিনিয়োগকারীদের মনে।

২। **প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা ঃ** ২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট খুব হৈচৈ করে

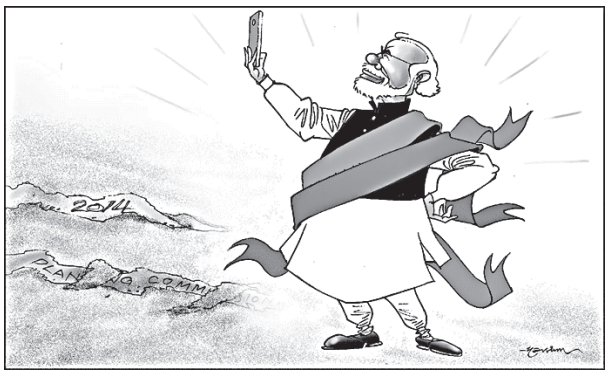

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা চালু হয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল। এই প্রকল্প 'আর্থিক অস্পৃশ্যতা' (financial untouchability) দূরীকরণের প্রথম ধাপ। এই প্রকল্প ঘিরে বিপুল উৎসাহের চোটে বহু জায়গায় ব্যাঙ্কগুলিকে ক্যাম্প করে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়েছে, ব্যাঙ্কের অন্যান্য কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত যেখানে অ্যাকাউন্ট খোলার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭.৫ কোটি তা ছাড়িয়ে ১১.৫ কোটি হয়েছে। মোট ৯,১৮৮ কোটি টাকা সঞ্চিত হয়েছে। গিনেস বুকে নাম উঠেছে। অথচ মহারাষ্ট্রসহ বিভিন্ন রাজ্যে এই অ্যাকাউন্টের সুবিধা সম্পর্কে দারুণ বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। যেমন, অ্যাকাউন্ট খুললেই ১ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। আবার পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন স্থানে তথ্য গোপন করে অ্যাকাউন্ট খোলার মতো সুযোগের অপব্যবহারের ভুরি-ভুরি উদাহরণ আছে। যেসব সুযোগগুলির কথা বলা আছে যেমন ১ লক্ষ টাকা দুর্ঘটনা বীমা, অতিরিক্ত ৩০,০০০ টাকা জীবন বীমা, ৫০০০ টাকা ওভারড্রাফটের সুযোগ, সেসবের সুযোগও গরিব মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না, কারণ আধারের সঙ্গে বিষয়টি যুক্ত এবং আধার পঞ্জীকরণের কাজ এখনও হয়নি। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত অভিজ্ঞমহলের ধারণা শুধুমাত্র 'হাইপ' তৈরর জন্যই প্রকল্পটি ঘোষিত হয়েছে। ব্যাঙ্কে এমনিতেই কর্মীসংখ্যা অপ্রতুল, তার ওপর এই বিপুল সংখ্যক অ্যাকাউন্ট এবং তার মাধ্যমে বীমা থেকে এলপিজি সাবসিডি পর্যন্ত সব কাজ সামলানোর পরিকাঠামো নেই। ব্যাঙ্কে একইরকমের সুযোগ যে প্রকল্পগুলিতে আছে বা কম সুদে দুর্বলতর অংশের জন্য ডিআরআই লোনের যে প্রকল্প আছে, সেগুলি ভালোভাবে চালাতে সরকার সহায়তা করতে পারতো, নতুন একটি প্রকল্প ঘোষণার প্রয়োজন ছিল না। এখন এই বিপুল সংখ্যক অ্যাকাউন্ট যার অনেকটাই 'ডরম্যান্ট' প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্কগুলির কাছে বোঝা।

৩। **মুদ্রা ব্যাঙ্ক ঃ** ২০১৫-র কেন্দ্রীয় বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের সমস্যার প্রতি। ঐ লক্ষ্যে ২০,০০০ কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করা হয়েছে বহু বিজ্ঞাপিত মুদ্রা ব্যাঙ্ক বা মাইক্রো ইউনিটস্ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফাইন্যান্স এজেন্সি ব্যাঙ্ক-এর জন্য। অর্থমন্ত্রক মার্চ মাসে ঘোষণা করেছে ব্যাঙ্কটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগপতিদের আর্থিক সহায়তাদানের নিয়মাবলী তৈরি করবে, নতুন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারেও সহায়তা দেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সারা দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলিকে যখন বাঁচিয়ে রাখাই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছে, ঋণের বেশি সুদ, বিদ্যুতের বর্ধিত দাম, বাজারে মন্দা, নতুন প্রযুক্তিতে সরকারী সহায়তার অভাব, ন্যূনতম মজুরীর হার না বাড়া, খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের অনুপ্রবেশ প্রভৃতি হরেক সমস্যায় পীড়িত এই ক্ষেত্রটি, তখন ঢাকঢোল পিটিয়ে মুদ্রা ব্যাঙ্ক তৈরি করা হল কেন যার কোনো নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাই নেই? ইতিমধ্যেই স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসডিবিআই), ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড) প্রভৃতির মাধ্যমে অতি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগগুলিকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা রয়েছে। আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড ট্রাস্ট, যার মাধ্যমে কোল্যাটারাল ছাড়াই ১ কোটি পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া যায়। অথচ ব্যাঙ্কগুলি এটা কার্যকর করে না। মুদ্রা ব্যাঙ্ক এই পরিস্থিতিতে নতুন কি করবে?—এই প্রশ্ন শিল্পমহলেই রয়েছে।

বৈদেশিক নীতি ঃ পশ্চিমের দিকে ঝুঁকছে কেন্দ্র ঃ

গত এক বছরে এ দেশের প্রধানমন্ত্রী একটা বড়ো সময় কাটিয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘোরার জন্য। অন্যান্য বিভিন্ন মন্ত্রকের মতো বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও মোদির একক ব্যক্তিগত চটজলদি সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর স্লোগান—'লুক ওয়েস্ট, অ্যাক্ট ইস্ট' প্রধানমন্ত্রী হয়েই প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্কে জোর দিলেও বর্তমানে পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে আস্থায় চিড় ধরেছে। শুধু বাংলাদেশের সঙ্গে ছিটমহল হস্তান্তর বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে গত মে মাসে।

বিদেশ ভ্রমণের সময়ে ভারতীয় বংশোদ্ভুতদের মধ্যে মোদির প্রচার লক্ষ্যণীয় ভাবে নজর কেড়েছে। বস্তুত বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের ভোটাধিকার দেবার উদ্যোগ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। মোদি স্পষ্টতই এদের গুরুত্ব দিচ্ছেন সে কথা মনে রেখেই। অন্য একটি সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। গুজরাট গণহত্যার সময়ে অনাবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির অর্থসংগ্রহের খবর সংবাদমাধ্যমে এসেছিল। সাম্প্রতিককালে অনাবাসী ভারতীয়দের প্রতি বর্ধিত মনোযোগ ঠিক কোন লক্ষ্যে এ প্রশ্ন অস্বস্তি জাগাবেই।

ইউপিএ-র সময় থেকেই মার্কিন ঘেঁষা বিদেশ নীতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। বর্তমান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলির দিকে আরও বেশি ঝুঁকছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার ভারতে আগমনের সময়ে ওবামা-মোদির যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চল সমস্যা সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে সমর্থন করে প্রকৃতপক্ষে চীনবিরোধী অবস্থান নিয়েছে ভারত। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলেছে ভারত। অন্যদিকে জাপান ভ্রমণকালে মোদি 'আগ্রাসনকারী চীন' বলে প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছেন। যদিও মোদির চিন ভ্রমণের প্রেক্ষিতে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিন-জাপান-ভারত ত্রিপক্ষীয় সামরিক মহড়া পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়া উদারনৈতিক যেসব উচ্চাকাঙ্ক্ষা মোদির আছে, বিদেশী বিনিয়োগ যেহেতু তার ভরকেন্দ্রে রয়েছে, সেজন্য চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখাও জরুরী। ফলে মার্কিন চাপ সত্ত্বেও চীন প্রভাবিত এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক-এর সদস্য হয়েছে ভারত। আবার গত বছর সার্ক দেশগুলির বৈঠকে অধিকাংশ দেশ চিনকে পূর্ণ সদস্যপদ দিতে চাইলেও, ভারত আপত্তি জানিয়ে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থান নিয়েছে। গোটা দক্ষিণ-এশিয়া অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে ভারতের এই দোলাচল সু-ইঙ্গিতবাহী নয়।

আবার পশ্চিম-এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটিতে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক গত এক বছরে যথেষ্ট অবহেলিত। ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অবস্থানে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুসারী। যদিও বর্তমানে নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা শেষ হয়ে আসছে বলে ভারত পারস্য উপসাগরে ইরানের চাবাহার বন্দর উন্নয়নের ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়েছে, ঐ বন্দরের মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার বাজারে প্রবেশের সুযোগকে মাথায় রেখে। কিন্তু এই অঞ্চলে আর এস এস এবং মোদির নিজেরও আদর্শগত বন্ধু ইজরায়েল। ফলে ইজরায়েলের গাজা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত উভয় দেশকেই সংযত হতে পরামর্শ দিয়েছে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা দেশ ভারত পৃথিবীর দুর্বল দেশগুলির কাছে যে আস্থা এবং মর্যাদার অবস্থানে বিরাজ করতো, তার থেকে ক্রমশ সরে আসা অনেক আগেই শুরু হলেও, গত এক বছরে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারসাম্য অনেকটাই পশ্চিমী উন্নত দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, অথচ ভারতের পক্ষে কোনো বাড়তি সুবিধা আদায় করা গেছে, ব্যাপারটা তেমনও নয়।

পরিবেশ রক্ষা ঃ ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্তের শিকার—

মোদি সরকারের প্রথম এক বছর পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি বেপরোয়াভাবে অবহেলিত হয়েছে। পরিবেশ, অরণ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রকাশ জাভাদেকর শুরু থেকেই মোদির কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন, ইউপিএ সরকারের সময়ে শিল্প প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মগুলি কঠিন। প্রকল্পের 'গতি মন্থর' হয়ে যায়। তাঁর মন্ত্রক প্রথম ৩ মাসে ২৪০টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়ে যথার্থ অর্থেই প্রতিশ্রুতি রেখেছে কর্পোরেটদের অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ছাড়পত্র পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এর মধ্যে সর্দার সরোবর বাঁধের উচ্চতা বাড়ানোর প্রকল্পও আছে। পরিবেশবিদরা প্রশ্ন তুলেছেন পরিবেশের ওপর প্রকল্পের ফলাফলের রিপোর্ট তৈরি করতে অন্তত একবছর লাগার কথা। কারণ বছরের বিভিন্ন ঋতুতে পর্যবেক্ষণ এক্ষেত্রে

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

কেন ২ সেপ্টেম্বর'১৫ রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শ্রমিক, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ধর্মঘট ?

রাজ্য সরকারের চার বছর

প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবের ফারাক

প্রণব কুমার কর

পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয় ২০১১ সালের ১৩ মে তারিখে। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, এস ইউ সি আই জোট বিপুল সংখ্যক আসনে জয়লাভ করেছে। মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৮.৪৩ শতাংশ ভোট পেয়ে জোটের আসন সংখ্যা দাড়ায় ২২৭টি। এই জোটকে কেন্দ্র করে যে তীব্র প্রত্যাশা তৈরি করা হয়েছিল মানুষের মধ্যে, ভোটের ফলাফলে তার প্রতিফলন ঘটে।

এরপর চার-চারটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। জোট সরকার একদলীয় সরকারে পরিণত হয়েছে। যে প্রত্যাশার ফানুস তৈরি হয়েছিল বর্তমান সরকারকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত দ্রুত তা চুপসে গিয়েছে। কারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস দল তাদের বিভিন্ন ইস্তেহার ও প্রচার পুস্তিকায় যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কোনোটারই কোনো বাস্তব ভিত্তিভূমি ছিল না। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস একটি ভিশন ডকুমেন্ট প্রকাশ করেছিল। সেখানে ক্ষমতায় আসার প্রথম ২০০ দিনের মধ্যে তারা কী কী কাজ করবে এবং প্রথম ১০০ দিনে কী কী কাজ করবে তার একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। আমরা যদি এখন একবার সেই তালিকার দিকে চোখ বুলিয়ে নিই তাহলেই প্রত্যাশার ফানুসটির ফুটো হবার কারণটা বুঝে যাব। সেই ভিশন ডকুমেন্টে বলা হয়েছিল—

১। A chain of Industrial Towns will be developed across the state and inter-linkages will be created.

২। Target creation of 300 ITI's (from the present 51) for basic skills with focus on SME's workers requirement.

৩। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে Massive Cluster Development Drive দেওয়া হবে প্রথম ২০০ দিনে।

৪। প্রতিটি জেলাতে একটি করে শিল্পতালুক গড়ে তোলা হবে। ২০০ দিনের মধ্যে তার ওয়ার্ক প্ল্যান তৈরি হয়ে যাবে।

৫। বন্ধ রাষ্ট্রীয় শিল্পগুলি খোলার চেষ্টা হবে। যেখানে খোলা যাবে না সেখানে ঐ জমিতে অন্য কারখানা হবে।

৬। উত্তর বাংলার চা বাগানগুলির আধুনিকীকরণ এবং পুনর্গঠন এবং এইভাবে দক্ষিণের জুটমিলগুলিকেও ঢেলে সাজানো হবে। উত্তর বাংলায় গাছ-গাছড়া এবং মেডিসিনাল প্ল্যান্টের ভিত্তিতে ওষুধ তৈরির কারখানা খোলার ব্যাপারে জোর দেওয়া হবে।

৭। It will endeavour to convert Darjeeling and adjoining Aliporeduar area into Switzerland of the East and Digha into Goa of the East Coast.

৮। নতুন বিমানবন্দর হবে মালদহ, কোচবিহার, বালুরঘাট, আসানসোল-দুর্গাপুর, মেদিনীপুর, বীরভূম এবং সাগরে।

৯। ১১টি নতুন মেডিকেল কলেজ খোলা হবে।

১০। ৫০০০, ৩০,০০০ এবং ১,২০,০০০ জন মানুষ পিছু এলাকায় যথাক্রমে সাব-সেন্টার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

১১। প্রত্যেক মহকুমায় যাতে অন্তত একটি করে Multi facility Hospital গড়ে ওঠে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

১২। হলদিয়া, দুর্গাপুর, খড়্গপুর, কল্যাণী এবং শিলিগুড়িতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রসারিত করা হবে।

১৩। টিকাকরণ চিকিৎসার অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য সেন্টার অব এক্সেলেন্স বা উৎকর্ষকেন্দ্র তৈরি হবে।

২০০ দিন কেন ১০০০ দিনও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অনেকদিন, কিন্তু এই অলীক প্রতিশ্রুতির একটিও বাস্তবের আলো দেখেনি। বরং আমরা দেখেছি বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আড়াই মাসের মধ্যে ১২টি দেশী মদের কারখানার ছাড়পত্র দিয়েছে, যেখানে স্বাধীনতার পর থেকে ৬৪ বছর পর্যন্ত মোট ১৫টি দেশী মদের কারখানা তৈরি হয়েছে রাজ্যে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এইরকম অবাস্তব প্রতিশ্রুতির তালিকা আরও দীর্ঘ—সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে রাজ্যে ৩০০০ কিমি রাস্তা তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ১ কিমি রাস্তাও তৈরি হয়নি। রাজ্যের ভুল জমি নীতিই এক্ষেত্রে দায়ী বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

বলা হয়েছিল সুন্দরবনসহ উপকূলবর্তী এলাকায় ৫০টি 'মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেন্টার' তৈরি হবে। এখনো পর্যন্ত একটিও তৈরি হয়নি।

সুন্দরবনে সাড়ে তিন হাজার কিমি নদীবাঁধ নির্মাণের বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাঁধের জন্য জমি দিলে চাকরি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। যদিও বর্তমানে তা স্বীকার করছে না সরকার। এখনও পর্যন্ত বাঁধ তৈরি হয়েছে ২৫০ মিটার।

কিন্তু শুধু প্রতিশ্রুতি পুরণে ব্যর্থতাই নয়, এই রাজ্যের মানুষ গত চার বছর ধরে প্রত্যক্ষ করেছে কিভাবে এই সরকার মানুষের এতদিন ধরে অর্জিত অধিকারগুলি পদদলিত করে মানুষের জীবন-জীবিকাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যদি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, কর্মসংস্থান, প্রশাসন, নারীদের সুরক্ষা, কৃষি এইসব দিকে নজর দিই তবে দেখতে পাব গত চার বছরে এই সবকটি ক্ষেত্রেই তৃণমূল সরকার চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে শিশু মৃত্যুর হার। রেজিস্ট্রার জেনারেল অব ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক 'স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সার্ভে'-এর যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে জন্ম থেকে ১ বছর বয়সী পর্যন্ত শিশুদের মৃত্যুর হার যখন ২০১০-১৩ এই সময়ের মধ্যে একই জায়গায় থমকে রয়েছে, সে সময়ে সেই মডেলের অন্যতম প্রাণপুরুষ ডঃ অরুণ সিংকে বর্তমান সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে বিতাড়িত করেছে। তিনি ছত্তিশগড়ের সরকারের অধীনে কাজ করে সম্প্রতি ভারত সরকারের পুরস্কার লাভ করেছেন। সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন তাদের প্রশাসনিক অগ্রগতির যে রিপোর্ট পেশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে এই দুই জেলায় গত এক বছরে নবজাতকের মৃত্যুর সংখ্যা ২৭০০ জন আর প্রসূতি মারা গেছেন ১১৯ জন।

শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে চূড়ান্ত অরাজকতা। আরাবুল থেকে শুরু করে তাজিমুল এদের হাতেই ধরা রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার রাশ। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রকাশ্যে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষক, শিক্ষিকাদের হেনস্থা, মারধর করে জোর করে ছাত্র সংসদ দখল করা, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে নমিনেশন তুলতে না দেওয়া, ফেল করা ছাত্রদের পাশ করানোর অযৌক্তিক দাবিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপাচার্যকে ঘেরাও করে রাখার মতো ঘটনা শুরু হয়েছে সারা রাজ্যের শিক্ষাঙ্গন জুড়ে। ৫০ বছর বয়স্ক বহিরাগত হেনস্থাকারীকে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সার্টিফিকেট দিচ্ছেন 'ছোট ছোট ছেলে' বলে। রাজ্য সরকার ছাত্র সংসদের নির্বাচন বন্ধ করে দিলে তার প্রতিবাদে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি যখন আইন অমান্য করে তখন পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হয় ছাত্র নেতা সুদীপ্ত গুপ্তের। সারা দেশ যখন উত্তাল এই ঘটনার বিরুদ্ধে তখন শাসক দলের পক্ষ থেকে ঘটনাটিকে 'পেটি ম্যাটার' বলা হয়। এর পাশাপাশি ফিরে এসেছে পরীক্ষার ক্ষেত্রে গণ টোকাটুকির দিনগুলি। পাশাপাশি এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা কমছে, যা আগামী দিনের জন্য একটি অশনি সঙ্কেত বহন করে আনছে।

গত চার বছর সময়কালে সব থেকে আলোচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্যতম হল রাজ্যে শিল্প স্থাপন। বর্তমান সরকারের নীতি হল শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণে সরকারের কোনো ভূমিকা থাকবে না। ফলে শিল্পগোষ্ঠীগুলি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি যোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে। এই ভুল জমি নীতির কারণে রাজ্যে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতেও অসুবিধা হচ্ছে। তৈরি করা যাচ্ছে না বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সম্প্রসারিত হচ্ছে না রাস্তা। ২০১০ সালে যেখানে ৩২২টি শিল্প প্রকল্প রূপায়িত হয়েছিল এবং বিনিয়োগ হয়েছিল ১৫ হাজার ৫২.২৩ কোটি টাকা সেখানে ২০১২ সালে ১২টি শিল্প প্রকল্পে বিনিয়োগ হয় মাত্র ৩১২.২৪ কোটি টাকা। ২০১৩ এবং ২০১৪ সালের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। শিল্পে অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল বিদ্যুতের চাহিদা। গত চার বছরে রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা কমেছে। ২০১২-১৩ অর্থ বর্ষে রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ৭৬১২ মিলিয়ন ইউনিট, ২০১৩-১৪ তে তা কমে দাড়ায় ৭৪৬৭ মিলিয়ন ইউনিটে। এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল ভ্যাট আদায়। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে যেখানে অন্ধ্রপ্রদেশে ভ্যাট আদায় হয়েছে ৪৮,৭৩৭ কোটি টাকা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ভ্যাট আদায় হয়েছে মাত্র ২১,৯৩১ কোটি টাকার।

একের পর এক বৃহৎ কারখানা পশ্চিমবঙ্গ থেকে উঠে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে হিন্দুস্তান মোটরস, জেশপ, শালিমার পেন্টস বন্ধ হয়ে গেছে। ২০টি জুটমিল বন্ধ হয়ে রয়েছে ফলে প্রায় ৬০ হাজারের বেশি শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। শাসক দলের উদ্যোগে হলদিয়া থেকে তাড়ানো হল এবিজিকে। এরপর জলপাইগুড়িতে প্রকল্প গুটিয়ে নিল ভিডিওকন, শালবনী থেকে চলে গেল জিন্দালদের ইস্পাত কারখানা। কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফে চোখে পড়ল না কোনো উদ্যোগ। অতি সম্প্রতি ইনফোসিসও রাজ্য ছেড়েছে রাজ্য সরকারে ভুল নীতির জন্য।

শিল্পক্ষেত্রের এই দুরবস্থার প্রভাব গিয়ে পড়ছে কর্মসংস্থানের উপর। রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগে ভাঁটা পড়ায় মারাত্মকভাবে কমে গেছে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর চাকরির বাজার, যার পরিণামে গত বছর ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কলেজে আসন ফাঁকা ছিল ৬৫ শতাংশই। এমনকি

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

রাজ্য সরকারের সরকারী কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী কিছু আদেশনামা

(১) 1583-F(P) dt. 21/02/2012— টাইপিস্ট পদকে ডাইং ক্যাডারে পরিণত করা এবং এর ফলে শুধু টাইপিস্ট পদে নিয়োগ বন্ধ হবে তাই নয়, সহায়ক এবং করণিকদের উপরেই টাইপ করার দায়িত্ব বর্তাবে।

(২) 283(60)-PS dt. 21/02/2012—28/02/2012 তারিখে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনগুলির ডাকে যে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল রাজ্য সরকারের সমস্ত কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক ভাবে অফিসে আসতে বলা হয়। বলা হয় যে ঐ দিনের জন্য কোনো ছুটি অনুমোদন করা হবে না।

(৩) 2013-F(P) dt. 6/3/12— 28/02/12 তারিখে অফিসে না আসলে পাঁচটি নির্দিষ্ট কারণ (যা এই আদেশনামায় উল্লেখ করা হয়েছে) ছাড়া অন্য কোনো কারণে ছুটি অনুমোদিত হবে না, ঐ দিনটি 'ডায়েস নন' বলে বিবেচিত হবে এবং ঐ দিনের বেতন কেটে নেওয়া হবে।

(৪) 254-F(P) dt. 18/02/13—20/02/13 এবং 21/02/13 তারিখে বিভিন্ন সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনের ডাকা ধর্মঘটে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বাধ্যতামূলকভাবে অফিসে উপস্থিত হতে বলা হয়।

(৫) 1832-F(P) dt. 01/03/2013- West Bengal Services (Appointment, Probation and Absorption of Group C Employees) Rules, 2013- গ্রুপ সি পদে নিয়োগের নতুন আদেশনামা। এ সংক্রান্ত পুর্ববর্তী নোটিফিকেশন নং 6060-F তাং 25/6/1979-এর সংশোধন ঘটিয়ে এই আদেশনামা জারি করা হয়। এর মধ্য দিয়ে নবনিযুক্ত কর্মচারীদের ৩ বছর প্রোবেশনে থাকতে হবে। প্রবেশন পিরিয়ডে প্রতি বছর শেষে তাকে যোগ্যতার পরিমাপ দিতে হবে। যোগ্যতার পরিমাপ সন্তোষজনক না হলে তাকে ছাঁটাই পর্যন্ত করা হতে পারে। প্রোবেশন পিরিয়ডে তার মহার্ঘভাতা এবং বাড়ি ভাড়া ভাতা থাকবে না। এই তিন বছর সময়কাল তার MCAS পাবার ক্ষেত্রেও গণ্য করা হবে না।

(৬) 8436-F(P) dt. 26/11/2013— কর্মচারীদের কোনো এসোসিয়েশনে, ইউনিয়ন বা জোট কর্তৃক নবান্নে কোন সভা, মিছিল বা বিক্ষোভ করা (meeting/procession/ demonstration) নিষিদ্ধ করা হল এই আদেশনামা দ্বারা।

(৭) 175-F(P) dt. 9/01/2014— এই নোটিফিকেশন দ্বারা W.B.S.R. Part-1 এর বিভিন্ন জায়গায় পরিবর্তন করে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ডেপুটেশন বা ডিটেলমেন্ট-এর দ্বারা ভারতবর্ষের মধ্যে বা বাইরে যে কোনো দপ্তর বা অফিসে এমন কি রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত কোনো কোম্পানি, কর্পোরেশন, আন্ডারটেকিং-এ পর্যন্ত স্থানান্তরিত করা যেতে পারে।

(৮) 3967-F(P) dt. 01/08/2014- রাজ্য সরকার দ্বারা পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত কোনো কোম্পানি, কর্পোরেশন, আন্ডারটেকিং, স্ট্যাটিউটরি বডি যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে সেখানে নিযুক্ত চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের অন্য কোনো সংস্থা বা সরকারী অফিসে নিযুক্ত করা হবে এই শর্তে যে তাকে ভবিষ্যতে নিয়মিত (regularised) করা হবে না।

(৯) 3402-F(P) dt. 24/04/2015– 30/04/15 তারিখের ধর্মঘটের দিন কর্মচারীদের বাধ্যতামূলকভাবে অফিসে উপস্থিত হতে বলা হয়।

(১০) 7600-F(P) dt. 20/09/15— পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাত থেকে গ্রুপ-বি এবং গ্রুপ-সি পদে নিয়োগের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। □

কেন ২ সেপ্টেম্বর'১৫ রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শ্রমিক, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ধর্মঘট ?

আর্থিক বঞ্চনা ও প্রশাসনিক আক্রমণ সীমাহীন

তাই আমরা ধর্মঘটের পথে

মনোজ কান্তি গুহ

সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

পশ্চিমবাংলার শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা বর্তমান রাজ্য সরকারের আক্রমণ, বঞ্চনা ও প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তাতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা প্রতিপালন করেছে। কারণ আক্রমণ সর্বগ্রাসী জোটবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ না হলে বর্তমান সরকারের স্বৈরাচারী আক্রমণকে মোকাবিলা করা যাবে না। সেই উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছে যৌথমঞ্চ। উদ্যোগ শুরু হয়েছে বহু আগে থেকে যার ফলশ্রুতিতে প্রথম কনভেনশন হয়েছিল ২৭ মার্চ'২০১৪ মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে। তাতে অংশগ্রহণকারী সংগঠনের সংখ্যা ছিল ৬টি। প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মচারী, কর্মী, নেতৃত্বকে উৎসাহিত করেছিল। যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়োজন অত্যন্ত ধৈর্য্য, আন্তরিকতা সহমর্মিতা। যতটা চাইবো সবসময় ততটা হয়তো হবে না। তারজন্য হতাশা বা নিন্দাবাদ করে লাভ নেই। সুসম্পর্ক রেখে যতটা এগোনো যায় আর সেটাই সংগ্রাম আন্দোলনে ঐক্যের বীজ বপন করে। আমাদের প্রথম যৌথ আন্দোলন কনভেনশনের পর আর অগ্রগতি ঘটানো যায়নি ঠিক কিন্তু একটা সম্পর্ক গড়ে দিয়ে গেছে যা বর্তমানে কাজে লাগছে। পরবর্তী কনভেনশান হয়েছে ১৪ নভেম্বর'১৪ মৌলালী যুবকেন্দ্রে। তখন অংশগ্রহণকারী সংগঠনের সংখ্যা ছিল ১৫টি। সেই কনভেনশনও ছিল উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর। তবে প্রথম কনভেনশনের সব অংশগ্রহণকারী সংগঠন ছিল না। কিন্তু তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, উৎসাহের দিক হচ্ছে সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। ধীরে ধীরে সংগঠনগুলির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এর মানসিক ঐক্য গড়ে উঠেছে। কেননা আক্রান্ত আমরা সবাই। উপলব্ধিতে এসেছে চরম আর্থিক বঞ্চনা ও আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই একমাত্র পথ। দ্বিতীয় কনভেনশন থেকে নানাবিধ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ছিল ১১-১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে লাগাতার দিবারাত্রি গণ-অবস্থান। ঐতিহাসিক, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী আন্দোলনের ইতিহাসে নজীরবিহীন। পরবর্তীতে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ধর্মতলার রানী রাসমণি এভিনিউ থেকে দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পার্ক পর্যন্ত সুসজ্জীত লাল পতাকায় উজ্জ্বলিত, উদ্দীপ্ত, স্লোগান মুখরিত শাসকের হৃৎপিন্ড কাঁপানো মহামিছিল। সেটা বোঝা গেছে শাসক শ্রেণীর রক্ষীবাহিনীর আচ রণে। মহামিছিলের সাফল্যমন্ডিত কর্মসূচীর পর নতুন কর্মসূচী গ্রহন করা যায় নি। কিন্তু দ্বিতীয় কনভেনশন আন্দোলন সংগ্রামের পথকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। কর্মসূচীর সাফল্য বৃহত্তর যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে উৎসাহ জুগিয়েছে। যেমন উৎসাহ সৃষ্টি করেছে সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় ট্রেড-ইউনিয়নগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

দমন, নিপীড়ন, বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বৃহত্তর পরিসরে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে গত ৯ জুলাই'১৫ মৌলালী যুব-কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কনভেনশন। উদ্যোক্তা সংগঠন ছিল ২১টি এবং বর্তমানে সংগঠনগুলির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮ টি। আরও অনেক সংগঠন ভবিষ্যতে যুক্ত হবে। যৌথ মঞ্চের দরজা খোলা যাঁরাই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইচ্ছুক তাঁদের সবাইকে স্বাগত। বর্তমান কনভেনশনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে সর্বভারতীয় ধর্মঘটকে সমর্থন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোষগার থেকে বেতন প্রাপ্ত সমগ্র অংশের কর্মজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চের আহ্বানে নিজস্ব ৯ দফা দাবিতে ধর্মঘট। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে নব্য-উদারীকরণের পথে চলা 'মা-মাটি-মানুষ' সরকারের বেতন সংকোচনের নীতি। প্রথমত, রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত, শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া ৪৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে দিতে হবে। বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং সেইমতো কার্যকরীও হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সালের প্রথমদিক পর্যন্ত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার কার্য্যকরী রূপ অকার্য্যকর হয়ে পড়ে। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর পুনরায় কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ ৩৪ বছর শাসনকালের অবসানের সময় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বকেয়ার পরিমান ছিল মাত্র ১৬ শতাংশ। আর বর্তমান সরকারের মাত্র চার বছর সময় কালে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৮ শতাংশ। আর্থিক সংকট বামফ্রন্ট সরকারেরও ছিল কিন্তু সরকার পরিচালনার দক্ষতায় এবং শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী প্রতি সহমর্মি মনোভাবের জন্য প্রতি বছর দুই কিস্তি করে মহার্ঘভাতা প্রদান করে কেন্দ্রীয় মহার্ঘভাতার ফর্মুলাকে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থে রক্ষা করেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় মহার্ঘভাতার ফর্মুলায় পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৩ শতাংশ আর সেখানে পশ্চিমবাংলা শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা পায় মাত্র ৬৫ শতাংশ। ভারতবর্ষের ছোট, বড়, মাঝারী রাজ্যগুলির মধ্যে যা সর্বনিম্ন মহার্ঘভাতা।

বর্তমান রাজ্য সরকার পরিচালনায় যে রাজনৈতিক দল রয়েছে, ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে বিশ্বায়নের নীতির বিরোধিতার বক্তব্য ছিল। পরিতাপের বিষয় ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে বিশ্বায়নের বেতন সংকোচনের নীতি গ্রহন করে। তাই প্রথম থেকেই বছরে এক কিস্তি মহার্ঘভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলস্বরূপ বেতনের ক্ষয়ের পরিমান বাড়তে বাড়তে বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেটা এক প্রকার বেতন সংকোচন। বর্তমানে একজন চতুর্থশ্রেণির (গ্রুপ-ডি পর্যায়) যাঁর পাঁচ বছর চাকুরী হয়েছে তিনি প্রতিমাসে ৩৬৮১ (তিন হাজার ছশো একাশী) টাকা কম পাচ্ছেন। তেমনি একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী (গ্রুপ-সি পর্যায়) যাঁর পাঁচ বছর চাকরী হয়েছে তিনি প্রতিমাসে ৪৯২৭ (চার হাজার নশো সাতাশ) টাকা কম পাচ্ছেন। তার উপরের কর্মচারী/আধিকারিকদের সংকোচনের পরিমান বিপুল, সব মিলিয়ে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রাপ্য অর্থ মেরে দেওয়ার পরিমান বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধেই ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট। দ্বিতীয় দাবি, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবি এবং ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্য্যকরী করতে হবে। মহার্ঘভাতা এবং বেতন কমিশনের মধ্যে তফাৎ বহুগুণ কারণ মহার্ঘভাতা মানে বেতনের ক্ষতিপূরণ বেতন বৃদ্ধি নয়। বেতন কমিশন মানে প্রতি দশ বছর অন্তর তৎকালীন মূল্যসূচকের ভিত্তিতে বেতনের পুনর্মূল্যায়ন যার মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি ঘটে। আমাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বেতন কমিশন গঠিত হয় ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে যা হাজরা কমিশন হিসাবে খ্যাত ছিল। সেই কমিশনেই প্রথম শ্রমিক, কর্মচারীদের প্রতিনিধি হিসাবে কে.জি.বসুকে কমিশনের সদস্য করা হয়েছিল। কমিশন শ্রমিক, কর্মচারীদের স্বার্থে বহুবিধ উন্নত সুপারিশ করেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। প্রথম বেতন কমিশনের রিপোর্ট তৎকালীন রাজ্যপাল ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেয় এবং ঘোষ-কুণ্ডু কমিটি দুই আমলাকে দিয়ে গঠন করা হয়। তাদের সুপারিশ কর্মচারী স্বার্থবিরোধী হয়েছিল তাতে কর্মচারীর বেতনও কমে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বেতন কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯৮১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। প্রকৃত অর্থে এটাই প্রথম পে-

কমিশন যার সুপারিশের ভিত্তিতে কর্মচারীদের বেতন স্কেল উন্নত হয়েছিল। শুধু তাই নয় প্রমোশনের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছিল যেমন করনীকদের ক্ষেত্রে ১:১ হারে L D C থেকে U D C তে পদোন্নতি। অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১/৩ গ্রেড -১ প্রমোশন ইত্যাদি বহুবিধ সুযোগ। তৃতীয় পে কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে। তাতেও বেতনের উন্নতিকরন এবং ১০-২০-র ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীমের পদ্ধতি চালু হয়। চতুর্থ বেতন কমিশন গঠিত হয় ১৯৯৮ সালে। উক্ত কমিশনের সুপারিশের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বেতন ফিক্সেশনে ৪০ শতাংশ বুস্টিং পদ্ধতি ফলে বরিষ্ঠ কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূরীভূত হয় সাথে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অর্জিত হয়, কিন্তু উক্ত কমিশন কার্য্যকরী রূপ পেয়েছিল ১৯৯৬ সাল থেকে। পঞ্চম বেতন কমিশন গঠিত হয়েছিল ২০০৯ সালে কিন্তু কার্য্যকর হয়েছিল ২০০৬ সাল থেকে। যার মধ্যদিয়ে কর্মচারী বেশ কিছু টাকা এরিয়ার হিসাবে পেয়েছিলেন। এই পে-কমিশনের মধ্যে দিয়ে পে-ব্যান্ড এবং গ্রেড-পে চালু হয়েছিল যা স্থিরকৃত হয়েছিল ১.৮৬ পয়েন্ট সূচকের উপর দাঁড়িয়ে। মেডিকেল এ্যালাউন্স বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩০০ টাকা। পঞ্চম বেতন কমিশনের শুধু ১ম অধ্যায় কার্য্যকরী করার সুযোগ পেয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। নির্বাচন ঘোষনা হয়ে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় কার্য্যকরী করার সুযোগ পায় নি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বর্তমান সরকার কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশগুলি কার্যকরী না করে ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শুধু তাই নয় ষষ্ঠ বেতন কমিশনের দাবিকে উপেক্ষা করে চলেছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে বহুবার পত্র দেওয়া সত্বেও উপেক্ষার মনোবৃত্তির কোন পরিবর্তন হয়নি। অথচ কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জন্য গঠিত সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ হবে। অন্যান্য রাজ্য সরকার বেতন কমিশন করার উদ্যোগ নিয়েছেন। আমাদের ক্ষেত্রে এই বঞ্চনার পরিমান আর কত দূর? তাই বঞ্চনার জবাবে ২রা সেপ্টেম্বর ধর্মঘট।

তৃতীয় দাবি, কর্মচারী, কর্মী ও নেতৃত্বের উপর হয়রানীমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক বদলী রদ। সমিতিগুলির সর্বোচ্চ স্তরের নেতৃত্ব থেকে কর্মী, কর্মচারী সবাইকে বদলী করা হচ্ছে শাসক শ্রেণির লেজুর সংগঠনের নির্দেশে আমলাবৃন্দর একাংশ সরাসরি শাসকদলের হয়ে রাজনীতি করছেন, কোন কোন আমলা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে শাসক দলের হয়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এক কথায় চলছে বদলীর প্রশাসনিক সন্ত্রাস। বদলী নীতিকে অকার্যকর করে নীতিহীন রাজনৈতিক বদলী চলছে। সদস্যপদ গ্রহনের প্রশ্নে বদলীর শর্ত আরোপিত হচ্ছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষকে জোর পূর্বক বে-আইনীভাবে জলপাইগুড়িতে বদলী করে রাতারাতি রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর একজন সদস্যকে পশ্চিম মেদিনীপুরে বদলী করা হয়েছে। যৌথমোর্চার একজন নেতৃত্বকে নবান্ন থেকে দার্জিলিং বদলী করেছে। তাই আক্রমনের বিরুদ্ধে আক্রান্তরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সেই জন্যই আগামী ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট সফল করুন।

চতুর্থ দাবি, পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের সুপারিশ কার্য্যকরী করা এবং সবার জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালু, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের গ্রুপ-সি কর্মচারীদের পূর্ণ বেতন এবং তিন বছর চাকুরীকাল সমাপ্ত হওয়ার পর স্থায়ীকরণ। এরজন্য চাই সাহসী সংগ্রাম, ক্রীতদাস হয়ে থাকা নয়। লড়াই-লড়াই-লড়াই চাই-তাই ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটে সামিল হোন।

পঞ্চম দাবি, সমস্ত ধরনের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা। পি.এস.সি'র স্বায়ত্বশাসনের অধিকার এবং পরিকাঠামো খর্ব করা চলবে না। শিক্ষার অধিকার আইনের অজুহাতে কর্মরত কোন শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর চাকুরীচ্যুতি চলবে না। স্থায়ী পদে স্থায়ী নিয়োগ চাই। প্রথা মেনে পি.এস.সি'র মাধ্যমে নিয়োগ করতে হবে।

ষষ্ঠ দাবি, চুক্তি ও অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্থায়ীকরণ এবং ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের রেগুলার এস্টাব্লিশমেন্টে যুক্ত করা। এই দাবির বিরুদ্ধে লড়াই মানে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। দাবি অর্জনের লড়াই এর পথ ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট।

সপ্তম দাবি, ধর্মঘটসহ পূর্ণ ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার, শিক্ষার মৌলিক অধিকার, শিক্ষাঙ্গনে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং বোর্ড কর্পোরেশনের কর্মচারীদের ওয়েস্টবেঙ্গল হেলথ স্কীম ২০০৮ এ অন্তর্ভুক্ত করা। শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও পঞ্চায়েত কর্মচারীদের জন্য ক্যারিয়ার এ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম চালু করা। সমগ্র অংশের কর্মচারী স্বার্থে-দাবি অর্জনে লড়াই এর পথে ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটের সাথে।

অষ্টম দাবি, নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে ব্যবস্থা, সর্বজনীন গণবন্টণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের ঐক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্রে এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নির্দেশে ধীরে ধীরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে গণবন্টণ ব্যবস্থার আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দেশের তথা রাজ্যের সমস্ত মানুষের সাথে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমরা এই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। আগামী ২ সেপ্টেম্বর সবাই গর্জে উঠুন।

নবম দাবি, মালিকের স্বার্থে-শ্রম আইন সংস্কার করা চলবে না চুক্তি প্রথায় ও অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত শ্রমিক, কর্মচারীদের ন্যুনতম ১৫০০০ টাকা মজুরী দিতে হবে। কোন অজুহাত চলবে না, ন্যায্য মজুরী দিতে হবে।

সারা বিশ্বজুড়ে চুক্তিপ্রথার কর্মচারীদের ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করা হয়। এই অংশের কর্মচারীদের সামান্য বেতনে ১০/১২ ঘন্টা কাজ করতে হয়। কোন সামাজিক সুরক্ষা নেই, কর্তৃপক্ষের ইচ্ছের উপর এঁদের চাকরীর ভবিষ্যত নির্ধারিত থাকে। মুখ বুজে কোন প্রশ্ন ছাড়া মালিকের মুনাফার স্বার্থে শ্রমশক্তি বিনিয়োগ করাই একমাত্র শর্ত। সারা বিশ্বজুড়ে চুক্তি প্রথার কর্মচারী ক্রমবর্দ্ধমান এবং স্থায়ী চরিত্রের শ্রমিক, কর্মচারীর অস্তিত্বের অবসান। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিশাল মজুত বাহিনী থাকায় শ্রমের বাজারে দর কষাকষী চলে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের সস্তার শ্রমশক্তি ক্রয় করে পুঁজিপতিরা মুনাফার পাহাড় তৈরী করছে আমাদের দেশে রাষ্ট্র এবং রাজ্যগুলির সরকার সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের এই উদ্যোগকে সাহায্য করছে। শ্রমিক, কর্মচারীরা যখন এই বঞ্চনা, নিপিড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে এবং প্রয়োজনে ধর্মঘটে যাচ্ছে তখন এইসব সরকারগুলি রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য নিয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বিপ্রতীপে শ্রমিক কর্মচারীরা তাতে ভীত না হয়ে বঞ্চনা, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী-প্রতিরোধের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব ইতিহাসে সংগ্রাম, আন্দোলন, ধর্মঘটের পর্ব চলছে, আজ সারা বিশ্বের শ্রমিক কর্মচারীদের উপর আক্রমণের লক্ষ্মণগুলি একই রকম, আন্দোলনের দাবিও একই রকম। বর্তমানে ধর্মঘটই শ্রমিক কর্মচারীর ক্ষেত্রে আন্দোলনের একমাত্র হাতিয়ার। এই হাতিয়ার প্রয়োগ করেই শোষনের রথের চাকা থামিয়ে দিতে হবে। সারা ভারতবর্ষের ১১টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এবং ৫০টি উপর সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলির যুক্ত আহ্বানে ১২ দফা দাবিতে আগামী ২ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় ধর্মঘট আহ্বান করেছে। সমস্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে শোষনের চক্রকে স্তব্ধ করতে।

আমরাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমগ্র অংশের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক আক্রমন এবং তীব্র আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে ৯ দফা সুনির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে আগামী ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটে সামিল হবো। সর্বভারতীয় ধর্মঘটের দাবিকে সমর্থন করে এবং আমাদের যৌথ মঞ্চের ৯ দফা দাবিকে সামনে রেখে আমাদের সর্বোচ্চস্তরের প্রস্তুতি চলছে।

শ্রমিক, কর্মচারী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমাজের কাছে বিশেষ করে চুক্তি প্রথা/অস্থায়ী চুক্তি প্রথার শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের কাছে আহ্বান ভয়, ভীতি আক্রমণকে উপেক্ষা করে জীবন জীবিকার স্বার্থে ধর্মঘটের প্রস্তুতির কাজে এগিয়ে আসুন। মিছিল, মিটিং, পথসভা, অন্যান্য সাংগঠনিক কাজে অংশ নিন। আগামী ১৩ আগষ্ট স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান দিবসে জেলা সদরে এবং কলকাতায় রানী রাসমনি এভিনিউর সমাবেশ যোগ দিন। ধর্মঘটকে সাফল্যমন্ডিত করার মানসিক দৃঢ়তা গড়ে তুলুন। জয় আমাদের হবেই হবে। □

যৌথ কনভেনশন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই কনভেনশনে এক ইতিহাস রচিত হল। এ সময়ে প্রয়োজন শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করে বন্ধুর সংখ্যা বাড়ানো। রাজ্য সরকার কর্মী-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি পূরণ না করে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছেন, কিন্তু মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বাড়ছে এমনকি জেলের ভিতরে থাকলেও। তিনি বলেন, আই সি ডি এস, আশা, মিড-ডে মিল কর্মী ও পার্শ্ব শিক্ষকরা আর্থিক ও পরিস্থিতিগত আক্রমণের শিকার। বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ছেয়ে গেছে। সমাজবিরোধীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের কারণ গভর্নিং বডিতে রয়েছে আরাবুলের মতো মস্তানরা। ৫০-৬০ হাজার টাকা দিয়ে কলেজে ভর্তি করা হচ্ছে। পোস্ট মাস্টার থেকে পরিবহন কর্মী এবং অধ্যক্ষ থেকে শিক্ষা-কর্মী সকলেই আক্রান্ত। তাই রাস্তায় নেমে আন্দোলন ছাড়া গতি নেই। তিনি বলেন, ২০১৬ সালে নতুন সরকার এলে শ্রমিক-কর্মচারীরা মাথা উঁচু করে দাবি-দাওয়া নিয়ে চলতে পারবেন। দীপক দাশগুপ্ত বলেন, '৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার বলেছিল রাইটার্স থেকে নয় তৃণমূল স্তর থেকে সরকার পরিচালনা করা হবে, আর ২০১১-তে সরকার এসে ১০ বছর বিরোধীদের চুপ করে থাকতে বলেছে। একজনের গলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও অপরজনের গলায় স্বৈরতন্ত্রের স্বর। তিনি বলেন, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারী। তিনটি কনভেনশনে এই অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন, নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলাই প্রধান কাজ, কারণ উদারনীতি ও ভোগবাদের প্রভাবে আক্রান্ত শ্রমিক-কর্মচারী। তাই নৈতিক দায়বদ্ধতার কারণেই তাঁরা যৌথ মঞ্চের কর্মসূচীকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করছেন। কুমারেশ কুণ্ডু বলেন, কর্পোরেট ধাঁচে ধনিক শ্রেণীর সরকার চলছে। শ্রম আইন সংস্কারের ফলে ৭০% শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন, যেমন জমি বিলের মাধ্যমে সমস্যায় পড়বে কৃষক। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত। সর্বশ্রেণী ও সব ঝাণ্ডা একসঙ্গে মিলে এর বিরুদ্ধে লড়াই করলে জয় নিশ্চিত। রমেন পাণ্ডে বলেন রাজ্যে শাসক দলের নৈরাজ্য ও কর্মচারীদের উপর আক্রমণ ও আর্থিক বঞ্চনা বেড়ে চলেছে। আই এল ও কনভেনশন ৮৭-র বিরুদ্ধে গিয়ে সরকার নোটিশ দিয়ে ধর্মঘট করলেও সার্ভিস ব্রেক করার হুমকি দিয়ে ধর্মঘট ভাঙছে। বিরোধী থাকাকালীন যে মুখোশ পরে থাকতেন এখন তা খুলে গেছে। তিনি বলেন, আমরা সব ঝাণ্ডা একসঙ্গে লড়াইয়ে থাকব এবং ২ সেপ্টেম্বর এক ঐতিহাসিক ধর্মঘট পালন করব। বাসুদেব বসু বলেন, এই সরকার সন্ত্রাসবাদী আবার নৈরাজ্যবাদীও। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে অভিযোগ কারীকেই জেলে ভরছে। দেশের কোন রাজ্যেই মন্ত্রীরা জেলে থেকে রাজ্য পরিচালনা করেন না। সম্প্রতি কালিম্পং এর ধসে ত্রাণের নামে প্রতারণা চলছে। নন প্ল্যান খাতে ক্লাবগুলোকে ৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কর্মচারীকে শাস্তিমূলকভাবে জি টি এ-তে বদলী করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সংগঠন দপ্তর খুলতে পারছে না। এন বি এস টি সি-র কর্মচারীদের ২৫% বেতন কেটে নেওয়া হচ্ছে। নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন সরকারে আসার আগে যা প্রতিশ্রুতি ছিল তা মানা হচ্ছে না। আগে কর্মচারীরা শারীরিক ভাবে আক্রান্ত হলেও, বদলী হলেও সংগঠন করব এই দৃঢ় মানসিকতা পোষণ করতেন। এখন আমরা আরও বেশি অর্থনৈতিক ও শারীরিক আক্রমণের শিকার। শিক্ষার নৈরাজ্যের কারণে সন্তানের শিক্ষা ও ভবিষ্যত দুইই অনিশ্চিত। তাই লড়াই অনিবার্য। ধর্মঘটের প্রচারে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে সর্বস্তরে তাই বলা যায় ধর্মঘট সফল হবে কারণ Any movement need public support। দপ্তরগুলিতে উপস্থিতি শূন্য করার আবেদন রাখেন তিনি। অশোক ঘোষ বলেন, মহার্ঘভাতা বাকী রাখা অন্যায়। না দিলে লজ্জা সরকারের। রাজ্যে নজিরবিহীন দমন পীড়ন বোঝাতে তিনি সাত্তোরের নির্যাতিতা মহিলার কথা তুলে ধরে বলেন, রাজ্যে আইন কানুন পদদলিত। তিনি আরও বলেন মধ্যবিত্তরাই আন্দোলনের গতিমুখ তৈরি করে এবং আপনারাই পরিবর্তনের অভিমুখ তৈরি করবেন। এরপর সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে উৎপল রায় উত্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে সকলের মতামত চান। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। পরবর্তীতে মনোজ কান্তি গুহ ধর্মঘটের অনুসারী হিসাবে ১৩ আগস্ট স্ট্রাইক নোটিশ ডে, কেন্দ্রীয় ভাবে দুটি মিছিল ও জেলায় জেলায় কনভেনশনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ঐতিহাসিক ধর্মঘটের প্রস্তুতি দ্রুত শুরুর সঙ্কল্পে কনভেনশন সমাপ্ত হয়। □

—সুতপা হাজরা

রাজ্য কাউন্সিল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রাজ্য সরকারের বেতনভুক সমস্ত অংশের শ্রমিক কর্মচারীদের সুদৃঢ় ঐক্য। সংগঠনের সর্বস্তরে এই ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে রাজ্য কাউন্সিল সভা।

৪ জুলাই বিকেল ৪টায় কাউন্সিল সভার কাজ শুরু হয়। সংগঠনের সভাপতি অশোক পাত্র, সহ-সভাপতিত্রয় চূণীলাল মুখার্জী, কৃষ্ণা বসু ও চন্দন ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী কাউন্সিল সভার কাজ পরিচালনা করে। শুরুতে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন সভাপতি অশোক পাত্র। সভায় উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যদের কাছে যে 'এজেন্ড নোটস্' পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল তার ভিত্তিতে প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা রাখেন সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। তাঁর উপস্থাপনায় ছিল দুটি অংশ— (১) বিগত সাংগঠনিক ও আন্দোলনগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা এবং (২) আগামী কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রস্তাব।

বিগত সাংগঠনিক কর্মসূচীর পর্যালোচনা যে বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি হল— (ক) সমিতি ভিত্তিক সদস্য সংগ্রহের সর্বশেষ অবস্থা, (খ) সংগ্রামী হাতিয়ার, এমপ্লয়িজ ফোরাম ও সমিতিগুলির মুখপত্রসমূহের গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের চিত্র, (গ) চতুর্থ কাউন্সিল সভা থেকে গৃহীত সংগঠন তহবিল সংগ্রহ অভিযানের অগ্রগতি সম্পর্কিত রিপোর্ট, (ঘ) রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতিগুলির বিভিন্ন স্তরের কমিটি ফাংশনিংকে উন্নত করা এবং (ঙ) কর্মচারীদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচীর পর্যালোচনায় যে বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি হল— (ক) ৫-৭ মে দপ্তরে দপ্তরে বডি পোস্টার পরিধানের কর্মসূচী। (খ) ৮ মে বিরতিকালিন সময়ে বিক্ষোভ সভা, (গ) ৯ জুন জেলা সদরে অথবা মহকুমা স্তরে ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে গৃহীত কর্মসূচী এবং (ঘ) বিভিন্ন সমিতির পক্ষ থেকে গৃহীত নিজস্ব দাবি দাওয়া ভিত্তিক কর্মসূচী।

সাধারণ সম্পাদক বলেন, উপরেক্ত সাংগঠনিক ও আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচীর যে সাধারণ মূল্যায়ণ কেন্দ্রীয় কমিটি করেছে তা হল— (১) সাংগঠনিক কর্মসূচীগুলি রূপায়ণের প্রশ্নে সাংগঠনের সর্বস্তরেই তৎপরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ত্রুটি দূর্বলতা, ফাঁক যে নেই তা নয়। ত্রুটি দূর্বলতা দুরে সরিয়ে সংগঠনকে আরো মজবুত করা প্রয়োজন। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা ছিল, প্রশাসনিকভাবে নব গঠিত আলিপুরদুয়ার জেলায় পূর্ববর্তী মহকুমা কমিটি জেলা কমিটির মর্যাদা নিয়ে কাউন্সিল পরবর্তী সময় থেকে কাজ করবে।

(২) আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচীগুলি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। বিশেষত বডি পোস্টার পরিধানের কর্মসূচীর নতুনত্ব কর্মচারীদের আকৃষ্ট করেছে। এই কর্মসূচীতে কর্মচারীরা যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তা আগে থেকে অনুমান করা যায়নি বলেই চাহিদামত বডি পোস্টার সরবরাহ করা যায়নি। ৯ জুন বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচীও প্রতিটি জেলায় ও কলকাতার অঞ্চলগুলিতে বিপুল সাফল্য লাভ করেছে।

সাধারণ সম্পাদকের প্রাথমিক প্রস্তাবনার ওপর ১৯টি জেলা (নবগঠিত আলিপুরদুয়ার জেলা সহ) সাতটি অঞ্চল ও একটি সহযোগী সমিতির পক্ষ থেকে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন মোট ২৭ জন। সমস্ত আলোচনা গুটিয়ে জবাবী বক্তব্য রাখেন অন্যতম সহ-সম্পাদক বিজয় শংকর সিন্‌হা। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেন। কাউন্সিল সভা সর্বসম্মতভাবে যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে। সেগুলি হল— (১) আগামী ৬-৭ এবং ১১-১২ আগস্ট ২০১৫ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির ব্লক সফরের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে।

(২) ডিসেম্বর '১৫ এবং জানুয়ারি ২০১৬-র বিভিন্ন সময়ে ১১টি অন্তর্ভুক্ত ও একটি সহযোগী সমিতির রাজ্য সম্মেলন কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) রক্তদানসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি প্রতিপালনে উদ্যোগ নিতে হবে।

(৪) যে সমস্ত সমিতি এখনও নিজস্ব দাবি-দাওয়া ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করেনি, তাদের সে বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে।

(৫) জুলাই মাসের মধ্যেই সমিতিগুলির সদস্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(৬) মুখপত্র সমূহের গ্রাহক সংগ্রহের কাজেও বাড়তি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৭) জুন-জুলাই মাসের বেতন থেকে নির্ধারিত হারে তহবিল সংগ্রহের কাজকে সংগ্রামের কর্মসূচী হিসেবে গণ্য করে, সমস্ত সাংগঠনিক শক্তিকে এই কাজে নিয়োজিত করতে হবে।

(৮) রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ২১টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ আহুত ৯ জুলাই ২০১৫-র কেন্দ্রীয় কনভেনশনকে সফল করতে হবে। জেলায় জেলায় বাস্তবতা অনুযায়ী অনুরূপ মঞ্চ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

(৯) আগামী ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনগুলির ১২ দফা দাবির ভিত্তিতে আহুত সর্বভারতীয় ধর্মঘটকে পূর্ণ সমর্থন জানাতে হবে।

(১০) ঐ একই দিনে নিজস্ব ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আহুত এ রাজ্যে শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করতে হবে। সভাপতির ধন্যবাদসূচক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কাউন্সিল সভার কাজ শেষ হয়। □

শাশ্বতী মজুমদার, প্রণব কর

রাজ্য সরকারের চার বছর

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

যাদবপুরে আসন খালি ছিল ১৪৭ টি এবং শিবপুরে ৬০টি। সরকারী স্তরে নিয়োগ প্রায় বন্ধ বললেই চলে। স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগকে কেন্দ্র করে চলছে চূড়ান্ত দুর্নীতি, ফলে রাজ্যের যুবদের বড় অংশই চলে যাচ্ছে অন্য রাজ্যে কাজের খোঁজে।

কৃষিক্ষেত্রে চলছে চরম নৈরাজ্য। ইতিমধ্যেই ফসলের দাম না পেয়ে ২৬ জন আলু চাষীসহ ১২০ জন কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। ন্যূনতম সহায়কমূল্য দিয়ে সরকারীভাবে ধান কেনার ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকরা বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করছেন। বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী সরকারের মতো বেনফেড, কনফেড, সমবায় ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করতে রাজী নয়। বর্তমানে কৃষককে লাইনে দাঁড়িয়ে খাদ্য দপ্তরের টোকেন সংগ্রহ করে রাইস মিলে ধান নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে, এই জটিল পদ্ধতিতে অনেকেই ধান বিক্রি করতে পারছেন না। আবার যেখানে বিহার, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড সরকার ধানের সহায়ক মূল্যের উপর যথাক্রমে ১০০ টাকা, ১৫০ টাকা এবং ২০০ টাকা করে বোনাস দিচ্ছে সেখানে রাজ্য সরকার বোনাস দিচ্ছে মাত্র ১৫ টাকা। আবার ২০১৪-১৫ সালে রাজ্য সরকারের ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু কিনেছে মাত্র ৬.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। আলু কিনেছে মোট উৎপাদনের ১৩ শতাংশ। ফলে পশ্চিম ভারতের মতো এ রাজ্যেও চলছে কৃষকের আত্মহত্যার মিছিল।

বর্তমানে এই রাজ্যে পুলিশ প্রশাসনের কোনো অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীর দল থানাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে আর পুলিশ প্রশাসন তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে আদেশ পালন করছে। এমনকি শাসকদলের হাতে পুলিশ নিজেও প্রহৃত হচ্ছে। ২০১১ সালের ৬ নভেম্বর ভবানীপুর থাকা কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে থানায় ভাঙচুর চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করল মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং থানায় গিয়ে ধৃতদের ছাড়িয়ে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো, মেয়রের ভাইঝি কর্তব্যরত পুলিশকে চড় মারার মধ্য দিয়ে যে ট্রাডিশনের জন্ম দিয়েছেন, শাসকদলের তৃতীয় শ্রেণীর নেতারা এখন তা বহন করে নিয়ে চলেছেন।

প্রশাসনের এই স্থবিরতায় স্বাভাবিকভাবে সারা রাজ্য জুড়ে দুষ্কৃতী ও সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মহিলাদের নিরাপত্তা। ২০১২ সালের প্রথমদিকে পার্কস্ট্রীটে একটি ধর্ষণের ঘটনাকে মুখ্যমন্ত্রী সাজানো ঘটনা বলে দেগে দেওয়ায় সারা রাজ্য জুড়ে ধর্ষকরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ আজ যেন ধর্ষকদের এক প্রমোদতরণীতে পরিণত হয়েছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আমরা আজ দুর্নাম কুড়োচ্ছি মহিলাদের উপরে অত্যাচারের ঘটনায়। অথচ পাঁচ বছর আগেও আমাদের রাজ্য মহিলাদের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান ছিল। আর এখন সত্তরোর্ধ্ব সন্ন্যাসিনী এই রাজ্যে ধর্ষিতা হচ্ছেন প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায়— এটাই বাস্তব।

পুলিশের নাকের ডগায় বসে উগ্রপন্থীরা বর্ধমানের খাগড়াগড়ে অত্যন্ত উন্নতমানের বিস্ফোরক বানাচ্ছে অথচ পুলিশ কিছুই জানতে পারছে না। একই কান্ড ঘটে চলেছে পিংলায়। বীরভূমের সাত্তোরে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট সশস্ত্র সমাজবিরোধীরা এলাকা দখলের লড়াইয়ে ব্যস্ত, প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ মানুষের, অথচ প্রশাসন নির্বিকার।

আর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের অনেক বাগাড়ম্বর করে এনেও বর্তমান সরকারের আমলে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে পাঁচ বার। দুধের দাম বেড়েছে লিটার প্রতি আট টাকা।

আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি হয়ে উঠেছে গত চার বছরে তা হল আর্থিক নৈরাজ্য। রাজ্য সরকার বাজার থেকে ব্যাপকভাবে ঋণ গ্রহণ করে চলেছে। চার বছরে ৮৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ করে ফেলেছে রাজ্য সরকার। ২০১৫-১৬ সালের শেষে রাজ্যর মোট এস্টিমেটেড ঋণ দাড়াচ্ছে ১ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা। বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতা থেকে সরে গেল তখন রাজ্যের ঋণ ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা যা স্বাধীনতার পরবর্তী ৬৪ বছরে তৈরি হয়েছে। আর বর্তমান সরকার পাচ বছরেই তার ৬০ শতাংশ ঋণ গ্রহণ করেছে। হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে ২০১১ পূর্ববর্তী সময়ের থেকে প্রায় ৮ গুণ হারে বর্তমান সরকার ঋণ গ্রহণ করছে। অথচ বর্তমানে কেন্দ্রীয় ঋণকে দীর্ঘমেয়াদী ২০ বছরে শোধ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সুদের হার করছে। বামফ্রন্টের উপর স্বল্প সঞ্চয়ের টাকা ঋণ হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে চাপতো। কিন্তু বর্তমানে তা হয় না। তা সত্ত্বেও এই বিপুল ঋণ গ্রহণ করতে হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী নিজে স্বীকার করছেন ঋণের দুষ্টচক্রের মধ্যে রাজ্য সরকার পরে গেছে।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অবস্থাও তথৈবচ। ৪৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া, ষষ্ঠবেতন কমিশন বসার কোন সম্ভাবনা নেই। শুধু তাই নয় এতদিন লড়াই করে ধর্মঘট সহ যে বিভিন্ন অধিকার কর্মচারীরা অর্জন করেছিল আজ তাও হরণের অপচেষ্টা চলছে। রয়েছে শুধু বদলীর ভয় আর অসংখ্য শূন্যপদ।

এই অরাজক অবস্থা বদলাবার জন্য শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারীদেরই এগিয়ে আসতে হবে নেতৃত্ব দিতে হবে।

এই সময়ে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন ফেলে দেওয়া ঘটনা হল চিটফান্ড কাণ্ড। অসংখ্য ভুঁইফোড় চিটফান্ড সংস্থা এই সময়কালে মানুষকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ৫০-৬০ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে তুলেছে। এর পিছনে শাসকদলের নেতা নেত্রীদের প্রত্যক্ষ মদত ছিল এবং এই টাকার বিপুল অংশ তারা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই কাণ্ডের যেখানে সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়ার কথা, সেখানে তার বদলে দেখা গেছে রাজ্য সরকার ১১ কোটি টাকা খরচ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন এ বিষয়ে সিবিআই-এর তদন্ত ঠেকাতে। সিবিআই তদন্তে একের পর এক শাসক দলের সাংসদ, মন্ত্রী এবং হেভিওয়েট নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথম একজন মন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় জেলে গেলেন। শুধু তাই নয়, জেলে থাকাকালীন অবস্থায় তাকে মন্ত্রীত্ব থেকে অব্যাহতি না দিয়ে এক অনন্য নজীর গড়েছে রাজ্য সরকার। ১০০ জনের মতো লোক আত্মহত্যা করেছেন চিটফান্ডের কেলেঙ্কারিতে সর্বস্বান্ত হয়ে। কিন্তু প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই তাতে।

শুধু চিটফান্ড নয়, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতেও কয়েক শো কোটি টাকার দুর্নীতি ধরা পড়েছে এই সময়ে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত শাসক দলের নেতা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকের কোনো শাস্তি হল না, অথচ যে সৎ পুলিশ আধিকারিক এই ঘটনার তদন্ত করেছিলেন এবং অভিযুক্ত প্রশাসনিক আধিকারিককে গ্রেপ্তার করিয়েছিলেন তাকেই শাস্তি দেওয়া হয়।

এরকম অনেক আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বর্তমান রাজ্য সরকার পরিচালনাকারী শাসকদলের মধ্যেই নেতানেত্রীরা যা আগে কখনও ভাবা যেত না। □

মোদি সরকারের এক বছর

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

জরুরি। বর্তমান সরকার আসার আগে ইউপিএ সরকারের সময়েই Comprehensive Polution Index-এর ভিত্তিতে ৪৩টি দূষিত শিল্পাঞ্চলে নতুন শিল্পের ছাড়পত্র দেওয়া স্থগিত রাখা হয়েছিল। জাভাদেকরের হস্তক্ষেপে এর মধ্যে ৮টি অঞ্চলে স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে গুজরাটের ভাপি এবং উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ আছে। ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যেই মোদি পরিবেশ সংক্রান্ত আইনগুলি পর্যালোচনা করার জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি তৈরি করেন। এই পর্যালোচনার আওতায় ছিল পরিবেশ রক্ষা আইন, ১৯৮৬, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২, অরণ্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৮০, জল (সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৭৪, বায়ু (সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১। তিন মাসের মধ্যে ঐ কমিটি আইনগুলি লঘু করে কর্পোরেটদের সুবিধা অনুযায়ী সিঙ্গল উইনডো ক্লিয়ারেন্সের সুপারিশ করেছে। এই যখন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি তখন ন্যাশানাল গ্রীন ট্রাইবুনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা চিন্তিত—কেউ জানে না কতদিন সংস্থাটি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। □

কেন ২ সেপ্টেম্বর'১৫ সর্বভারতীয় ধর্মঘট ?

মোদি সরকারের দুর্নীতি

দেবাশীষ রায়

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ-২ সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের অন্যতম প্রচারের হাতিয়ার ছিল একের পর এক দুর্নীতি। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোটের প্রধানমন্ত্রী পদ প্রার্থী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি তাঁর নির্বাচনী প্রচারে দুটি বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন— (১) দুর্নীতি মুক্ত, কেলেঙ্কারি মুক্ত স্বচ্ছ সরকার উপহার দেবেন। (২) বিদেশ থেকে কালোটাকা ফিরিয়ে আনবেন। মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে নিজেকে চা বিক্রেতা বলে গর্ববোধ করা মোদিজী আজ প্রধানমন্ত্রী। চা-বিক্রেতা থেকে দেশ বিক্রেতায় রূপান্তরিত প্রধানমন্ত্রী গত ১৬ এপ্রিল কানাডার টরন্টোয় বুক বাজিয়ে বলেছিলেন যা তা বাংলা ভাষান্তর করলে দাড়ায়— ''আগে দেশ পরিচিত ছিল 'স্ক্যাম-ইন্ডিয়া' অর্থাৎ দুর্নীতির ভারত বলে, এখন আমরা চাই দেশকে 'স্কিলড্-ইন্ডিয়া' হিসাবে পরিচিত করতে।'' গত ২০ মে, টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিজেপি-র সভাপতি অমিত শাহ দাবি করেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতি দুর করেছে।' নীতি-নৈতিকতা নিয়ে এই বাগাড়ম্বরের মাঝেই আই পি এল দুর্নীতিতে অভিযুক্ত ও ফেরার ললিত মোদির সাথে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজের অনৈতিক আঁতাতের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় বিজেপি দল ও কেন্দ্রের সরকারের দুর্নীতিমুক্ত সরকারের প্রতিশ্রুতি যখন প্রশ্নের মুখে, ঠিক তখনই মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম কেলেঙ্কারিতে সুপ্রিম কোর্টের সি বি আই তদন্তের নির্দেশ, মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী পঙ্কজা মুণ্ডে সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ঘোটালার অভিযোগ, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি-র বিরুদ্ধে শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে অসত্য তথ্যের অভিযোগ শুনানির জন্য দিল্লির পাতিয়ালা হাউস আদালতে গ্রহণ, দেশের মানুষের সামনে এই সত্যই হাজির করছে রাজা বদলায়, শাসকদলের পরিবর্তন হয় কিন্তু দুর্নীতি আর উদারনীতির সহাবস্থানের কোনো বদল হয় না এরা একে অপরের পরিপূরক।

● ললিত-সুষমা-বসুন্ধরা-যোগ

গত ৭ জুন, লন্ডনের 'দি সানডে টাইমস' পত্রিকা একটি খবর প্রকাশ করে যে, ব্রিটিশ এম পি কিথ ভাজ গত বছরের জুলাই মাসে লন্ডনে ঘাঁটি গেড়ে থাকা ললিত মোদির পর্তুগাল যাতায়াত সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরি করবার জন্য সে দেশের অভিবাসন দপ্তরকে অনুরোধ করেন। তাঁর আবেদনে কিথ ভাজ জানান যে ভারতের বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ ললিত মোদিকে বিদেশ যাত্রার অনুমোদন দেওয়ার জন্য বারে বারে তদবির করেছেন। গত ২০১০ সাল থেকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যে ললিত মোদির বিরুদ্ধে Foreign Exchange Management Act (FEMA) অমান্য করার জন্য তদন্ত করছে, যার বিরুদ্ধে আই পি এল সংক্রান্ত চারটি মামলায় মোট ১ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এবং যিনি এ দেশের বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লন্ডনে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন গত ৫ বছর যাবত, তাঁর প্রতি কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রীর এই আচরণের সাফাই হিসাবে শ্রীমতী স্বরাজ বলেছেন যে, ক্যান্সার আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ললিত মোদি যাতে পর্তুগাল যেতে পারেন তাই 'মানবিক কারণে' তিনি পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপি এবং আর এস এস-ও যথারীতি এ হেন কু-যুক্তিকে সমর্থন করে একজন অপরাধীকে সাহায্য করার বিষয়টিকে বৈধতা দিতে চেয়েছে। যখন এ দেশের বিদেশমন্ত্রক আইন ভাঙার দায়ে পাঁচ বছর আগেই ললিত মোদির পাসপোর্ট বাতিল করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর আর্থিক অনিয়মের তদন্ত এখনও চলছে এবং অবিলম্বে বিচারালয়ের সামনে হাজির হওয়ার জন্য 'ব্লু-কর্ণার' নোটিশ জারি হয়েছে, তখন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রীর তাকে সাহায্য করতে এহেন তৎপরতা কার্যত নীতিহীনতারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ বই কিছু নয়।

প্রকৃত সত্য এটাই যে ললিত মোদির পরিবারের সঙ্গে সুষমা স্বরাজের পরিবারের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। গত ২২ বছর যাবত সুষমা স্বরাজের স্বামী স্বরাজ কৌশল মোদির আইনজীবী। আই পি এল টুর্নামেন্টে আর্থিক তছরূপের দায়ে অভিযুক্ত ললিত মোদিকে আইনি সহায়তা দিয়েছে যে একদল আইনজীবী, তার অন্যতম বিদেশমন্ত্রীর কন্যা বাঁশুরী স্বরাজ। অর্থাৎ ললিত মোদি ও স্বরাজ পরিবার পেশাগত ও আর্থিকক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এর থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় বিদেশমন্ত্রীর সুপারিশের সঙ্গে কি স্বার্থ জড়িত। পর্তুগালে মোদির স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ললিত মোদির যাওয়া সে দেশের আইনে বাধ্যতামূলক নয়। মোদির স্ত্রী চাইলেই সেই হাসপাতালে তাঁর প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার হতে পারে। বিশেষ করে এই সেই হাতপাতাল, যে হাসপাতালের জন্য রাজস্থানে জমি পাইয়ে দিয়েছে মোদি-রাজে ব্রিগেড, সেখানে মোদির স্ত্রীর চিকিৎসায় যে কোনো ত্রুটি হবে না তা বলাই বাহুল্য। তা সত্ত্বেও মোদিকে লন্ডনের বাইরে যেতে দেওয়ার জন্য ব্রিটেনের একাধিক মন্ত্রী ও আধিকারিককে সুষমা স্বরাজের ঘন ঘন চিঠি লেখা প্রমাণ করে যে বিজেপি সরকারের নীতি-নৈতিকতা নিয়ে বড়াই কতটা অন্তঃসারশূন্য।

লোলিত মোদির সাথে আরো গভীরভাবে যে ব্যক্তির নাম যুক্ত হয়ে গিয়েছে তিনি ঢোলপুরের রাণী শ্রীমতী বসুন্ধরা রাজে, যিনি বর্তমানে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী। অনেকেই বলেছেন ২০০৩-০৮ সালে বসন্ধুরা রাজের প্রথম মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালে রাজস্থানে সংবিধান বর্হিভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ললিত মোদি। তার 'আমির হেরিটেজ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি' জয়পুরের কাছে দুটি পুরোনো হাভেলি কেনে, যেটাকে পরবর্তী গেহলট সরকার বেআইনি ব্যবসায়িক লেনদেনের অভিযোগে বাতিল করে দেয়। ই ডির একটি তদন্ত রিপোর্টে বেরিয়েছে, ২০০৮ সালে বসুন্ধরার মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রথম পর্বে ললিত মোদির সংস্থা আনন্দ হেরিটেজ হোটেলে প্রায় ২১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে মরিশাসের একটি বেনামী সংস্থা। যার মধ্যে প্রায় ১১.৬৩ কোটি টাকা হাত বদল হয়ে পৌঁছায় বসুন্ধরার পুত্র তথা বিজেপি সাংসদ দুষ্মন্ত সিংয়ের মালিকানাধীন নিয়ন্ত হেরিটেজ হোটেলের অ্যাকাউন্টে। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, ঋণ ও শেয়ারের দাম মেটানো বাবদ ললিত ওই টাকা দিয়েছিলেন দুষ্মন্তের সংস্থাকে। কিন্তু ইডির বক্তব্য, দুষ্মন্তের সংস্থাকে ঘুরপথে (ভায়া মরিশাস লাইন) আর্থিক ফয়দা পাইয়ে দিতে শেয়ারের দাম কয়েকশো গুণ বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল। (আ বা প/১৮-০৬-১৫) বিদেশে পাচার করা কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার বড়াই করা দলের সাংসদের সংস্থায়-ই কালো টাকা সাদা হয়ে ঢুকেছে। সরকারী সম্পত্তি ঢোলপুর রাজপ্রাসাদও ললিত যোগে বেসরকারী অভিজাত হোটেলে পরিণত হয়েছে বসুন্ধরা-দুষ্মন্তের বদান্যতায়। 'ইন্ডিয়া টুডে' টিভি চ্যানেল ফাঁস করে দিয়েছে, বসুন্ধরা যখন রাজস্থান বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের নেত্রী ছিলেন, তখন ২০১১ সালের ১৮ আগস্ট ললিত মোদির ভিসা আবেদনপত্রে সাক্ষী হিসাবে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন : (বাংলা ভাষান্তরে) ''অভিবাসনের জন্য ললিত মোদি যে আবেদন করেছেন তার সমর্থনে আমি এই বিবৃতি দিচ্ছি, তবে একটি শর্তে যে, আমার এই সহায়তা কোনক্রমেই যেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত না হয়। '' (দ্য টেলিগ্রাফ/১৭-০৬-১৫) ভারতীয় কর্তৃপক্ষ না-জানতে পারার শর্তে (কী ভয়ঙ্কর রাষ্ট্র বিরোধী শর্ত!) ললিত মোদির অভিবাসনের আবেদনে বসুন্ধরার সাক্ষী হওয়ার গোপন তথ্য আজ সর্বসমক্ষে বেরিয়ে পড়েছে। এছাড়াও জানা গেছে, ২০১২ ও ২০১৩ সালে ললিত মোদির স্ত্রী যখন অপারেশনের জন্য পর্তুগালের হাসপাতালে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন স্বয়ং বসুন্ধরা।

● অভাবনীয় দুর্নীতির অপর নাম ব্যাপম

প্রায় নিত্যদিন, বস্তুত নজিরবিহীন মৃত্যু মিছিল চলছে মধ্যপ্রদেশে। আর্থিক কেলেঙ্কারি, প্রশাসনিক দুর্নীতি স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অনেক হয়েছে। কিন্তু হাড় হিম করা রহস্য আর রাজ্য জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ কখনও তৈরি হয়নি, কোনো বিশেষ দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে। ২০০৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত এই কেলেঙ্কারিতে মৃতের সংখ্যা ৪৭, যদিও মধ্যপ্রদেশ পুলিশের বক্তব্য মৃতের সংখ্যা ৩৭। শুধু এই জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই এ ধরনের মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, যাদের মধ্যে রয়েছেন 'ইন্ডিয়া টু ডে'-র সাংবাদিক অক্ষয় সিং, যিনি ব্যাপম নিয়ে তদন্তমূলক রিপোর্ট লিখছিলেন, রয়েছেন জব্বলপুর মেডিক্যাল কলেজের ডিন ডাঃ অরুণ শর্মা যার মৃতদেহ দিল্লির এক হোটেলে পাওয়া গেছে। ডাঃ শর্মা প্রচুর নথিপত্র ও প্রমাণ জমা দিয়েছিলেন।

মধ্যপ্রদেশ ব্যবসায়িক পরীক্ষা মণ্ডল সংক্ষেপে ব্যাপম হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকার অধীনস্থ একটি স্বশাসিত সেল্ফ-ফিন্যান্সড পর্ষদ। এই পর্ষদের পরিচালন কমিটিতে রয়েছেন বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং শীর্ষে রাজ্যের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি। আগে শুধুই মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য পরীক্ষা নেওয়া হত এই বোর্ডের মাধ্যমে। পরবর্তীতে এই পর্ষদ বিভিন্ন কলেজে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, পলিটেকনিক, ফার্মাসি, নার্সিং, বি এড, কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন পাঠক্রম, বি-টেক-এর বিভিন্ন পাঠক্রম, প্রি মেডিক্যাল টেস্ট, হোমিওপ্যাথি, প্রাণিচিকিৎসা প্রভৃতি প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে আছে। এছাড়াও শিক্ষক, পুলিশ, চিকিৎসক নিয়োগও হয় ব্যাপমের মধ্য দিয়ে।

২০০৯ সালের এরকমই একটি প্রি-মেডিক্যাল টেস্টে কারচুপির অভিযোগ ওঠে। ইন্দোরের চক্ষু চিকিৎসক ও সমাজকর্মী আনন্দ রাই-এর এই সম্পর্কিত জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে রাজ্য সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি ২০১১ সালে তার রিপোর্টে ভুয়ো পরীক্ষার্থী এবং টাকা লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে বলে জানায়। এরই ভিত্তিতে ২০১২ সালে বিশেষ টাস্ক ফোর্স (এস টি এফ) গঠিত হয়। ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে এস টি এফের তদন্তে প্রকাশ পায় যে, ২০১২ সালের চাকরিতে নিয়োগের পাঁচটি পরীক্ষায় দুর্নীতি করেছে ব্যাপমের আধিকারিকরা। দুর্নীতিগ্রস্থ আধিকারিক, রাজনৈতিক নেতা ও প্রভাবশালীদের আঁতাতে আসল পরীক্ষার্থীর বদলে পরীক্ষা দিত অন্য মেধাবী ছাত্র, অবাধ টোকাটুকি, আগে নম্বর পরে উত্তর প্রভৃতি ঘটতো এবং এসবে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হতো। এস টি এফ ১১৩ জনের বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করে, যার মধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ঘনিষ্ঠ মাইনিং ব্যারণ সুধীর শর্মারও নাম ছিল, যিনি পরবর্তীতে খুন হয়েছেন। ডিসেম্বর মাসে এস টি এফ ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা (পি এম টি) কেলেঙ্কারিতে ৩৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয়। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন ছাত্র, অভিভাবক ও চার উচ্চপদস্থ আধিকারিক। এস টি এফের এই তদন্ত ফল প্রকাশ্যে আসার পরই ৪০ জনের খুন অথবা অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। ২০০৯ সালে ২১ নভেম্বর প্রথম অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় পি এম টি-র মিডলম্যান বিকাশ সিং ঠাকুরের। এ পর্যন্ত ১৫ জন পি এম টি-র মিডলম্যান এবং ২ জন পুলিশ নিয়োগের মিডলম্যান খুন হয়েছেন। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও রাজ্যপাল রামনরেশ যাদবের বিরুদ্ধেও এই কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। ফরেস্ট গার্ড নিয়োগের পরীক্ষায় দুর্নীতির ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তাঁর ছেলে শৈলেন যাদবের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ ছিল, এ বছরের মার্চে তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে, খুন হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী লক্ষ্মীকান্ত শর্মা। পুলিশ এখনও পর্যন্ত এ তদন্তে ২ হাজারের ও বেশি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলেও মুল অভিযুক্ত বিনোদ ভাণ্ডারী আজও ফেরার। অন্য রাঘব বোয়ালরাও ধরাছোয়ার বাইরে। উপরন্তু এই কেলেঙ্কারির সাক্ষী, অভিযুক্ত যারা তদন্তে সহযোগিতা করছেন, অক্ষয় সিং-এর মতো সাংবাদিক, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও ডিন যারা এই কেলেঙ্কারির সত্য উদ্‌ঘাটন করছেন তাঁদের খুন হতে হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের ব্যাপম কেলেঙ্কারিতে সি বি আইকে তদন্তের নির্দেশ এই মৃত্যু মিছিলকে বন্ধ করে প্রকৃত অপরাধীদের সাজা দেবে বলে মধ্যপ্রদেশের সমাজকর্মী আনন্দ রাই, আশিস চতুর্বেদীরা মনে করেন।

এদিকে স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রতিষ্ঠায় যিনি নাকি প্রাণপাত করছেন তিনি একবারও বলছেন না কি করে মহারাষ্ট্রের বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের মন্ত্রী পঙ্কজা মুণ্ডে বিনা টেন্ডারে একদিনে ২০৮ কোটি টাকার সামগ্রী কেনার বরাত দিচ্ছেন। তিনি মাননীয় স্মৃতি ইরানীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঘোষণা সংক্রান্ত ধোঁয়াশা নিয়েও নিশ্চুপ। তিনি একটি বারও বলছেন না যে, একজন কালো টাকার কারবারির সাথে তাঁর দল ও মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের যোগাযোগ রাখাকে তিনি কি চোখে দেখেছেন। বিরোধীরা যতই সুষমা-বসুন্ধরা-শিবরাজ- স্মৃতির পদত্যাগের দাবিতে সরব হন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দল যে এদের পিছনে আছে দৃঢ়ভাবে তা প্রতিদিন প্রমাণিত হচ্ছে। 'প্রধান সেবক' হওয়ার দাবি করেন যে প্রধানমন্ত্রী তিনি যে আমজনতার সেবক নন, দলের সেবক, পুঁজির দালালদের সেবক তা ক্রমশ প্রমাণিত হচ্ছে। □

৯ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বিক্ষোভ কর্মসূচী

সারাসরি প্রশাসনিক ও শাসকদলের জামা পরিহিত কর্মচারীদের বন্ধু সাজার ভেকধারী হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সংগঠনের দুষ্কৃতীবাহিনীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই গোটা জেলার ২৯টি ব্লকের কর্মচারীরা আলিপুরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে জমায়েত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। বিকাল ৫:১৫ মিনিটে শ্লোগানে মুখরিত ৬ দফা দাবি সোচ্চারে উচ্চারিত হওয়ার মধ্য দিয়ে জেলা জমায়েত ও বিক্ষোভ কর্মসূচীর সুচনা হয়। সভায় দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সমীর সরকার। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা সম্পাদক তাপস বসু উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে ৬-দফা দাবির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তীব্র আক্রমণের মুখে দাড়িয়েও যেভাবে গোটা জেলার কর্মী নেতৃত্ব সংগঠনের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছেন তার জন্য লাল সেলাম জানান। জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক তথা কর্মচারী আন্দোলনের জেলা নেতৃত্ব সুযশ চক্রবর্ত্তী বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে জেলা জুড়ে বর্তমান রাজনৈতিক আক্রমণ এবং জেলা সংগঠনকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ২০১১ পরবর্তী সময়কাল থেকে প্রশাসনিক উদ্যোগগুলির বিষয় স্মরণ করিয়ে বলেন, ভয় দেখিয়ে-হুমকি দিয়ে-জেলে পাঠিয়ে বদলী করে জেলা সংগঠনকে ভেঙে দেওয়া যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে না। নয় শতাধিক কর্মচারীর জমায়েত পরিচালনা করেন উৎপল দাস ও দেবাশীষ পালকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। আলিপুরে কর্মরত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা এই কর্মচারী জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
44th Year, 3rd Issue, July 2015

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

গণবিক্ষোভের উত্তাল ঢেউ ফিরে এল গ্রিসে

মানস কুমার বড়ুয়া

বিগত জানুয়ারিতে গ্রিসে কৃচ্ছ্রসাধন কর্মসূচীর বিরুদ্ধে প্রবল গণবিক্ষোভের মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল বামপন্থী মঞ্চ সাইরিজার পক্ষে যায়, যারা এই সংগ্রাম আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল। সাইরিজার প্রতিশ্রুতি ছিল শ্রমিকদের মজুরী ও পেনশন সুরক্ষিত থাকবে এবং বেসরকারীকরণ বন্ধ করা হবে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর প্রবল আর্থিক সঙ্কট থেকে মুক্ত হতে নতুন সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তে ত্রৈকা (আই এম এফ, ই সি বি ও ইউরোপিয় কমিশন)-র সাথে বেল আউট চুক্তিতে যেতে বাধ্য হয়। এর দ্বারা আরও বোঝা চেপে বসে জনগণের উপর। বেকারীর হার বৃদ্ধি পায়, রাজস্ব আয় হ্রাস পায়। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকা একটি দেশকে বারবার ব্ল্যাকমেল করে ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছে ত্রৈকা। ঋণ নিতে নিতে গ্রিসের ঋণ দাঁড়িয়েছে জিডিপি-র ১৭৫ শতাংশ। জুন মাস থেকে ইউরোপের নেতারা ও আই এম এফ-এর পক্ষ থেকে গ্রিসকে চাপ দেওয়া হয় যে, যদি পুনরায় বেলআউট পেতে হয় তবে আরও কঠোর শর্তেই তা নিতে হবে। শর্তের মধ্যে ছিল পেনশন ছাঁটাই, যুক্তমূল্য কর বৃদ্ধি, কর বাবদ অতিরিক্ত আয় দিয়ে বিদেশী ঋণ পরিশোধ, শ্রম আইন সংস্কার ইত্যাদি।

এই সময় গ্রিসের অর্থনীতি গভীরতর সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়। জি ডি পি ৩০ শতাংশ হ্রাস পায়, বেকারী ২৬ শতাংশে পৌঁছায়। যুবদের মধ্যে বেকারী মারাত্মকভাবে ৫৬ শতাংশে পৌঁছায়। আয়ের দিক দিয়ে দারিদ্র্যসীমার নীচে পৌঁছায় ৪৪ শতাংশ মানুষ। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কঠিন শর্তে বেল আউট নেওয়া হবে কি না তার জন্য গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী সিপ্রাস ২৭ জুন সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন গণভোটে যাওয়ার জন্য। গণভোটের দিন ঠিক হয় ৫ জুলাই। ইতিমধ্যে ৩০ জুন গ্রিস আই এম এফ-এর কাছে ১.৬ ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণ খেলাপী হয়। ই সি বি-কে আগামী ২ মাসে শোধ করতে হবে ৬৬৫ কোটি ইউরো। ওই মুহূর্তে গ্রিসের প্রয়োজন ছিল ৭২০ কোটি ইউরো।

৫ জুলাই অনুষ্ঠিত গণভোটে কঠিন শর্ত মেনে ঋণ না নেওয়ার পক্ষে অর্থাৎ 'না' ভোট দেন ৬১.৩ শতাংশ ভোটার। ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী ভোটারদের মধ্যে 'না' ভোট দিয়েছেন ৭৫ শতাংশ।

সাইরিজা সরকারের প্রধানমন্ত্রী সিপ্রাস ভোটের আগে জনগণকে 'না' ভোট দেওয়ার আহ্বান করেছিলেন। জনগণের বিপুল অংশ বিশেষ করে ছাত্র ও যুবদের ব্যাপক অংশ 'ত্রৈকা'-র শর্তাবলীকে প্রত্যাখ্যান করার পক্ষেই রায় দিয়েছে।

বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিকে ভেদ করা বা ব্যয়সংকোচনের জমানার সমাপ্তি ঘটানো এবং গ্রিসের মানুষের অধিকারের উপর আক্রমণের ইতি টানার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পক্ষ হল গ্রিসের ইউরো থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজস্ব মুদ্রা 'দ্রাঘমা' চালু করা এবং দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার

রাষ্ট্রায়ত্বকরণ। এই পথ নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য ও যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু ত্রৈকার শর্ত মেনে ইউরোজোনে থেকে যাওয়া মানে হোল গ্রিসকে ঋণ দাসত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং গণতন্ত্র ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারাবাহিক ক্ষয়।

যে ইস্যুতে জনাদেশ 'না' বলেছিল, একই ইস্যুতে প্রচার করেই বামপন্থী মঞ্চ সাইরিজা ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু গণভোটের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য দেশগুলি বিশেষ করে জার্মানীর কঠোর অবস্থান এবং প্রবল চাপের মুখে একতরফা শর্তে মেনে জনাদেশের পুরোপুরি বিরুদ্ধে গিয়ে সাইরিজা সরকার আত্মসমর্পণ করল। ব্রাসেল্‌সে ১৩ তারিখ ভোরে টানা ১৭ ঘণ্টা বৈঠকের পর গ্রিস পেতে চলেছে তৃতীয় বেল আউট। এথেন্স থাকছে ইউরো জোনেই। শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে— 'ত্রৈকা' গ্রিসের সংস্কার কর্মসূচী দেখভাল করবে এথেন্সে অবস্থান করে। কর কাঠামো ও পেনশন ব্যবস্থার সংস্কার, শ্রমবাজারের উদারীকরণের জন্য অবিলম্বে আইন প্রণয়ন। নমনীয় করা হবে বাণিজ্য আইন। এমনকি দুধ ও রুটি উৎপাদন পর্যন্ত বিনিয়ন্ত্রণ করা হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ করা হবে। এথেন্স কেন্দ্রিক ৫০০০ কোটি ইউরোর একটি বিনিয়োগ তহবিল গড়া হবে, যে তহবিলের অর্থ আসবে গ্রিস সম্পত্তি বেসরকারীকরণ ও বিক্রির মধ্য দিয়ে। এর মধ্য দিয়ে ২৫০০ কোটি ইউরো গ্রিস ব্যাঙ্কগুলিতে নতুন করে বিনিয়োগ করা হবে ঋণ পরিশোধের জন্য। ১২৫০ কোটি ইউরো ব্যবহার করা হবে ঋণ ও জি ডি পি-র অনুপাত কমাতে। বাকি ১২৫০ কোটি ইউরো বিনিয়োগের জন্য।

এই নিয়ে পাঁচ বছরে তৃতীয় বেল আউট। আগামী তিন বছরের জন্য ৮৬০০ কোটি ইউরো (৯৬০০ কোটি মার্কিন ডলার) দিতে রাজি হয়েছে ইউরোপ, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আই এম এফ) এবং ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (ই সি বি)। এর মধ্যে ১২০০ কোটি ইউরো দিয়ে ই সি বি-র ঋণ পরিশোধ করতে হবে আগস্টের মাঝামাঝি নাগাদ। তবে ত্রাণের অর্থ পেতে হলে সব শর্তই ১৫ জুলাই-এর মধ্যে পাশ করতে হবে গ্রিস সংসদে।

স্বাভাবিকভাবেই চুক্তিতে উচ্ছ্বসিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড টুস্ক। গ্রিস প্রধানমন্ত্রী সিপ্রাসের মতে, কয়েক বছর ধরে চলা মন্দা থেকে দেশকে তুলে আনতে এবং গ্রিসের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিপর্যয় রুখতে এই প্যাকেজ আনবে নতুন বিনিয়োগ। তিনি চুক্তির পক্ষে বলতে গিয়ে বলেন, 'চুক্তিটি কঠিন তবে সরকারী সম্পত্তি বিদেশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকে আটকানো গিয়েছে। আমরা এড়াতে পেরেছি অচলাবস্থা এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিপর্যয়কে।' গণভোটের ফল প্রকাশের পর পদত্যাগ করা সাইরিজা সরকারের অর্থমন্ত্রী ইয়ানিস ভারোফাকিসদের প্রথম প্রতিক্রিয়া, "একটি নতুন ভার্সাই চুক্তি। গণতন্ত্রকে গুঁড়িয়ে দিতে সেদিন ব্যবহার করা হয়েছিল সমরাস্ত্র, ট্যাঙ্ক। আর এখন ব্যাঙ্ক। এই রাজনীতির অবমাননা।" তাঁর পরামর্শ ছিল সংসদে চুক্তিটি পাশ করানোর পরিবর্তে সিপ্রাসের অবিলম্বে নতুন নির্বাচনে যাওয়া উচিত। নিজের দলেরই একাধিক সদস্য সিপ্রাসের বিরুদ্ধে গেছেন।

এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর পরই গ্রিসের মানুষ প্রতিবাদ বিক্ষোভে রাস্তায় নামেন। গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি (কে কে ই)-র ট্রেড ইউনিয়ন অল ওয়ার্কার্স মিলিট্যান্ট ফ্রন্ট (পেম) ১৫ জুলাই সংসদে চুক্তি পেশের দিন গোটা দেশ জুড়ে বিক্ষোভ-মিছিলের আহ্বান জানায়। উল্লেখ্য পেম বিগত কয়েকবছর ধরে গ্রিসে ব্যয়সংকোচন বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বার বার ধর্মঘটের মাধ্যমে গ্রিসকে স্তব্ধ করে দিয়েছে তারা।

১৫ জুলাই অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলের সাহায্য নিয়ে কঠোর অর্থনৈতিক পদক্ষেপকে অনুমোদন করেছে গ্রিস সংসদ। সংসদে যখন তুমুল বিতর্ক চলছে, নিজের দলের সাংসদদের বিদ্রোহের মুখে প্রধানমন্ত্রী আলেক্সিস সিপ্রাস, তখন সংসদের বাইরে মধ্যরাতে হাজার হাজার প্রতিবাদী মানুষ। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে গ্রেপ্তার হচ্ছেন ১০ জন।

সাইরিজার সদস্য কিংবা সরকারের ছোট শরিক আনেলের সদস্যদের সমর্থনে শুধু নয়, খসড়া বিলটি পাশ হয় বিরোধীদল ইউরোপপন্থী নিউ ডেমোক্রেসি, পোতামি এবং পাশেকের সমর্থনে। ৩০০ সদস্যের সংসদে উপস্থিত ২৯৯ জনের মধ্যে পক্ষে ভোট দেন ২২৯ জন। বিপক্ষে ৬৪ জন। ভোটদানে বিরত ছিলেন ৬ জন। সাইরিজার ১৪৯ জন সাংসদের মধ্যে পক্ষে ভোট দেন ১১১ জন। ১১৮ জন আনেল সহ বিরোধী দল নিউ ডেমোক্রেসি, পোতামি এবং পাসোকের। সাইরিজার ৩২ জন দেন বিপক্ষে ভোট। ৬ জন ভোটদানে বিরত থাকেন। সাইরিজার বিরুদ্ধে তথাকথিত বামপন্থী মঞ্চ খসড়া বিলের বিরোধিতা করলেও, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে তারা সরকার ও প্রধানমন্ত্রীকে পুরোপুরি সমর্থন করবে।

ওই দিনই গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি (কে কে ই)-র ট্রেড ইউনিয়ন অল ওয়ার্কার্স মিলিট্যান্ট ফ্রন্ট (পেম)-র ডাকে এথেন্স সহ দেশের ৫০টি শহরে সমাবেশ-মিছিল-বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। পেমের আহ্বান— নয়া নৃশংস ও নির্লজ্জ চুক্তি বাতিল করো। সবাই রাস্তায় নামো, এখনই শুরু হোক লড়াই। দেশের বৃহত্তম জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ম্যাসিডোনিয়ার মস্ত্রকের দখল নিয়েছে সংগঠন। কে কে ই-র সাধারণ সম্পাদক দিমিত্রিস কৌতসোমপাস বলেছেন, "চুক্তিটি মারাত্মক রকমের পলকা'। ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তীব্র হবে আমেরিকা ও ইউরোপের লড়াই। তবে এই সংঘাতের বলি হতে হবে গ্রিক জনগণকে। ... প্রকৃত পথ হল ইউরোপিয় ইউনিয়ন, পুঁজি ও তার ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। আত্মসমর্পণ নয়, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের সংগ্রামই একমাত্র রাস্তা।"

যে রাস্তায় গ্রিসের মানুষ ২০১০ সালে প্রথম বেল আউট নেবার পর থেকেই ছিল, জানুয়ারি ২০১৫-তে বামপন্থী মঞ্চ সাইরিজার সরকার যে সংগ্রামের অন্যতম ফসল— পুনরায় তার চেয়েও তীব্র সংগ্রামের রাস্তায় নামতে বাধ্য হল গ্রিক জনগণ। জার্মানী সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ, ই সি বি, আই এম এফ-এর ক্রমাগত মহাজনী কায়দার চাপে সাইরিজা সরকার তার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এল। ভয়ঙ্কর দিক হল ঘোলা জলে মাছ ধরার পুরানো খেলা এখানেও খেলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এটা প্রমাণিত হয় সংসদে ভোটাভুটি চুক্তি পাশ হবার পর সাইরিজার রেডিও স্টেশনে চুক্তি চূড়ান্ত করতে ভূমিকা পালনের জন্য মার্কিন সরকার এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাকে যখন সরকারের উপরাষ্ট্রপতি ওয়াই দ্রাগাসাকিস প্রকাশ্যে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন। কে কে ই-র সাধারণ সম্পাদক সঠিকভাবেই বলেছেন- শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের সংগ্রামই একমাত্র রাস্তা। □

১০ম ফার্মাসিস্ট ডে প্রতিপালিত

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ড. অসীম দাশগুপ্ত।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টস এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১০ম ফার্মাসিস্টস ডে, ৫ জুন, ২০১৫ বেলগাছিয়ার ভেটেরিনারি কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে প্রতিপালিত হয়েছে। প্রথম পর্বে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ মনোজকুমার ঘোষ, বিজ্ঞানী, ন্যাশনাল ডেয়ারি রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট (NDRI)-কল্যাণী, ডঃ প্রদীপ কুমার দাস, ডঃ সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার, অধ্যাপক পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

দ্বিতীয় পর্বে ফার্মাসিস্টস্ ডে উপলক্ষে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ডঃ অসীম দাশগুপ্ত, রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সুমিত ভট্টাচার্য, সম্পাদক, সংগ্রামী হাতিয়ার, কর্মচারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়। উভয় বক্তাই কর্মচারীদের উপরে বর্তমান সরকারের আক্রমণ, নির্যাতন ও করণীয় তুলে ধরেন।

সমিতির বিচারে স্বপনকুমার সৌ-কে বর্তমান বছরের সেরা ফার্মাসিস্ট-এর পুরস্কার দেয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বন্দনা ভট্টাচার্য, সমিতির সভানেত্রী। □

ধর্মঘটের সমর্থনে যৌথ মঞ্চের প্রচার কর্মসূচি

□ ২২-২৯ জুলাই জেলায় জেলায় যৌথ কনভেনশন।
□ ২৭ আগস্ট ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতায় ছুটির পর কেন্দ্রীয় মিছিল। রানি রাসমনি এভিনিউ থেকে কলেজ স্কোয়ার। ঐ একই দিনে প্রতিটি জেলায় মিছিল।

ভ্রম সংশোধন

জুন সংখ্যার সপ্তম পৃষ্ঠায় সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ১২ দফা দাবিসনদ উল্লিখিত হয়েছিল। কিন্তু ৬ নং দাবিটি ভুলবশত অনুল্লেখিত থেকে গেছে। দাবিটি হল— 'জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত সংশোধনী বিল বাতিল করতে হবে।'

— পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী

৯ জুন ২০১৫ জেলা জমায়েত, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা।

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।